আলেয়া

(আল্‌বার্তো মোরাভিয়া)

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিন্যু
জবাকুসুম হাউস: কলিকাতা-১২

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স-এর
পক্ষে শ্রীরণজিৎ সেন কর্তৃক
'জবাকুসুম হাউস', কলিকাতা-১২
হইতে প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ : দোল-পূর্ণিমা, ১৩৬৬

দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রচ্ছদ শিল্পী : অরুণ মৈত্র

ব্লক করেছেন : লাইন য়্যাণ্ড টোন

ছেপেছেন : শ্রীরামকৃষ্ণ পান
লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস
২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

‘রাজলক্ষ্মী’কে

ভূমিকা

১৯০৭ সালে রোম নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এ যুগের জনপ্রিয় কথাশিল্পী আলবার্তো মোরাভিয়া। তাঁর Woman of Rome, Conjugal Love, The Conformist, A Ghost at Noon, Two Women ইত্যাদি রচনা পাঠক-সমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেছে। সাম্প্রতিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিপিকার হিসাবে অভিনন্দিত হয়েছেন তিনি।

প্রধানতঃ, রোমের জীবনই মোরাভিয়ার রচনার উপজীব্য। যৌবনের দ্বন্দ্ব ও আশা নিরাশা, রূপ-পসারিণীর প্রেম, দাম্পত্য-বিরোধ ও জীবন সংগ্রামে পরাজিত ব্যর্থ সাহিত্য-সাধকের মর্ম-বেদনার চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণ তুলিকায়। বাস্তবানুগ তাঁর কাহিনীর সঙ্গে সর্ব দেশের ও সর্ব কালের যোগসূত্র সহজেই আবিষ্কার করা যায়। তাই মোরাভিয়ার রচনা স্বতঃই চিত্ত জয় করতে পারে। তা'ছাড়া, রচনার বলিষ্ঠতা, সাবলীলতা ও সারল্য, কল্পনার বিশালতা, অপূর্ব সৃজনীশক্তি, অনুপম প্রকাশভঙ্গী ও সরস বিশ্লেষণ মোরাভিয়ার সৃষ্টিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুদীর্ঘ রসোত্তীর্ণ সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন তিনি; জীবনের সত্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেন অভিনব অকাট্য যুক্তির বলে। মোরাভিয়া তাঁর পাঠক-পাঠিকাকে এক অনাবিষ্কৃত আনন্দ-লোকের সন্ধান দেন, অ-দৃষ্ট ও অননুভূতপূর্ব অথচ সম্ভাব্য জীবনের অবিস্মরণীয়, হৃদয়গ্রাহী কাহিনী শোনান, বিভিন্ন চরিত্র ও মানব-মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব অননুকরণীয়

ভঙ্গিতে রূপায়িত করেন। তাঁর কল্পনা বাস্তবকে পরিহার করে চলে না, বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে বিচিত্র সেতু-নির্মাণ করেন তিনি, বাস্তব জীবনালেখ্য তাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে অপরূপ হয়ে ওঠে।

A Ghost at Noon মোরাভিয়ার এক বিস্ময়কর শিল্প-কীর্তি। দাম্পত্য-জীবনের একটি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী তিনি ব্যক্ত করেছেন এ উপন্যাসে। এ সুধু কাহিনী নয়, এতে রয়েছে সত্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।······কোন অশুভ মুহূর্তে অসন্তোষ ও সন্দেহের বীজ উপ্ত হয় মিলন-মধুর দাম্পত্য-জীবনে। সে-বীজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, অচিরে দাম্পত্য-জীবনের মর্ম্ম-মূল থেকে শুষে নেয় প্রেম-রস-ধারা। একদিন যারা স্বপ্নময়, বাধাহীন, বিচ্ছেদহীন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনগুলির কল্পনায় নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করেছিল, তাদের মাঝখানে অতর্কিতে নেমে আসে বিচ্ছেদের কৃষ্ণ যবনিকা।······

···"তরুণ নাট্যকার মলটেনি ও তার পরিণীতা এমিলিয়া···বিবাহের পরবর্তী দু'টি বছর পরমানন্দে কেটে যায় তাদের স্বপ্নরাঙা দিনগুলি··· দু'জনে দু'জনকে নিখুঁত মনে করে, ভাবে—পরস্পরের মধ্যে পূর্ণতার অভাব নেই এতটুকু···কিন্তু স্বচ্ছলতা নেই তাদের জীবনে···অর্থের অনটন, তাই তারা বাস করে ছোট্ট একটি ভাড়াটে বাড়িতে···একটি নিরাপদ, নিশ্চিন্ত ও সম্পূর্ণ নিজস্ব আশ্রয় নীড় রচনার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে এমিলিয়া···চিত্রনির্মাতা বাত্তিসতা মলটেনিকে একটি চিত্রনাট্য-সম্পাদনার ভার দেন···মলটেনি তখন মনের উল্লাসে পত্নী এমিলিয়াকে নিয়ে আসে একটি মনোরম আধুনিক ফ্ল্যাট এ···

ঠিক এ সময়েই ভাঙন ধরে তাদের দাম্পত্য জীবনে···

কেন ?···এই ভয়ঙ্কর প্রশ্ন, মলটেনিকে করে চিন্তাকুল, তার উৎসাহ ও উদ্যম নষ্ট করে, চূর্ণ করে দেয় মর্যাদার অভিমান···নিজের মধ্যেই

সে খোঁজে এ প্রশ্নের উত্তর···প্রশ্ন করে এমিলিয়াকে···জবাব পেতে চায় —যেমন করে হোক···তার মনে জেগে ওঠে জিঘাংসা···প্রায় উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে সে···

অবশেষে 'ক্যাপ্রি'র 'লাল-গুহা'য় শুয়ে নিদাঘের মধ্যাহ্নে দেখে অশরীরী এমিলিয়াকে···তার না-বলা-বাণী অন্তরে জাগিয়ে তোলে প্রচণ্ড আলোড়ন।······

এই উপন্যাসে মোরাভিয়া রোমের চিত্র-জগতের জীবনের ছবি এঁকেছেন।······বাত্তিসতা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও সুযোগ্য চিত্র-নির্মাতা, পাসেত্তির পত্নী স্বামীগতপ্রাণা, জার্মাণ রেনগোল্ড মনস্তাত্ত্বিক চিত্র-নির্দেশক—'ওডিসি'র চিত্র রূপায়ণে সাহায্য করবেন তিনি। 'ওডিসি'র চিত্রগ্রহণ-পরিকল্পনা, ইউলিসিস পেনিলোপ-এর সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত—মলটেনি-এমিলিয়ার সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে।

উপন্যাসটির সুনিপুণ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাঠক-পাঠিকাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।···

দু'টি স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, জীবনে সুখী হতে চায় তারা, সার্থক করতে চায় দাম্পত্য-জীবন। মোরাভিয়ার এ দু'টি চরিত্র-রূপায়ণ সার্থক, তাঁর সর্বোত্তম সাহিত্য-সৃষ্টির নিদর্শন।"······

কলিকাতা
দোল-পূর্ণিমা
১৩৬৬

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত
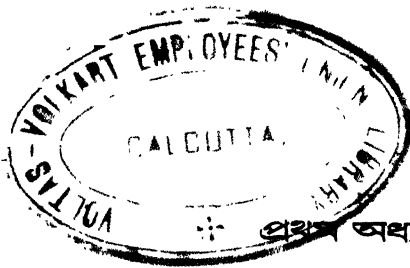
প্রথম অধ্যায়

কী অনাবিল তৃপ্তিতেই না কেটেছিল আমার দাম্পত্য-জীবনের প্রথম দু'টি বছর!

পত্নী এমিলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল মধুর। সে আমায় ভালবাসতো, আমিও ভালবাসতাম তাকে। সে কী গভীর প্রেম! দু'টি প্রাণ এক হয়ে গিয়েছিল। রঙীন স্বপ্ন-বিভোর মন, বাধাহীন সম্ভোগ-শান্ত জীবন! কপোত-কপোতীর মতো নির্ভর সুখে কেটে যাচ্ছিল প্রেম-গুঞ্জন-মুখর দিনগুলি। দু'জন দু'জনকে ভালবাসতাম নির্বিচারে, মুহূর্তের অদর্শন সহ্য হতো না। প্রেম ছাড়া আর কোন চিন্তার অবকাশ ছিল না তখন। কবির কথায়, আমাদের অবস্থা ছিল—'পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি'। ভাবতাম—প্রেমময়ী এমিলিয়ার কোন খুঁত নেই; সেও হয়তো ভাবতো—স্বামী হিসাবে আমিও নিখুঁত। কোন অসতর্ক মুহূর্তে কখনও দু'জনের দোষ-ত্রুটি হয়তো চোখে পড়তো। কিন্তু তীব্র প্রেমাবেগে এত মত্ত ছিলাম যে সেদিকে খেয়ালই ছিল না। প্রেমের সম্মোহিনী শক্তিতে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম আমরা। কখনও কল্পনাই করতে পারি নি—দু'জনের নিবিড় প্রেম-বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে একদিন, ভেঙে যাবে এই নিরুদ্বেগ জীবনের স্বপ্ন, অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝায় ধূলিসাৎ হবে আমাদের সুখ-নীড়, সমাধি রচিত হবে এমন দুর্লভ প্রেমের, বিরহ-বেদনায় ও অনুশোচনায় বয়ে বেড়াতে হবে সেদিনের স্মৃতি।.........

তখনও আমাদের প্রেম-সম্পর্ক রয়েছে অটুট। এমিলিয়াকে আমি ঠিক তেমনি ভাবেই ভালবাসছি, আমার প্রেম এতটুকুও কমেনি। এমন সময় হঠাৎ এমিলিয়ার চোখে ধরা পড়লো আমার ত্রুটি, সে মনে মনে বিচার করে দেখলো আমায়, বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো আমার উপর, প্রত্যাহার করলো তার প্রেম, আমায় ভালবাসল না আর।.........

তা'ই নিয়ে এই কাহিনী।...

পরিপূর্ণ সুখ খোলা চোখে দেখা যায় না। কথাটি হয়ত আজগুবি মনে হবে। তাই বুঝিয়ে বলছি:

তখন মাঝে মাঝে জীবন একঘেয়ে মনে হতো; তবুও আমি যে সুখী ছিলাম—একথা বুঝতে পারিনি। ভাবতাম, সবাই যা করে আমিও তাই করছি। পরিণীতাকে ভালবাসছি, বিনিময়ে পাচ্ছি তার ভালবাসা। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই, কোন বিশেষত্ব নেই। পত্নীর ভালবাসা তো আর দুর্লভ সামগ্রী নয়! একটি বারও মনে হয়নি—বাতাস যখন অবিরাম বয়ে যায়, তখন কেউ তার মূল্য বোঝে না; কিন্তু বাতাসের অভাব হ'লেই তা' হয়ে ওঠে অমূল্য। তখন যদি কেউ এসে আমায় বলতো—আমি সুখী, তা'হলে অবাক হয়ে যেতাম। তাকে বলতাম, না না আমি সুখী নই। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, সেও ভালবাসে আমায়, কিন্তু আমার অনাগত ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়। একটি সস্তা দৈনিকের চিত্র-সমালোচনা ও সাংবাদিকতা করে যা' রোজগার করি তা'তে সচ্ছলভাবে দিন চলে না। হোটেলের ছোট একটি কামরায় থাকি, উদ্বৃত্ত ব্যয় তো দুরাশা—প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের জন্যও কখনও কখনও অর্থের অনটন হয়। আমি আবার সুখী হবো কেমন করে?.........

কিন্তু যখন নিজেকে সত্যিকারের সুখী মনে করলাম, তখন ভাবিনি—আগেই আমি ছিলাম প্রকৃত সুখী।.........

দু'বছর পরে কপাল খুললো আমার। চিত্র-নির্মাতা বাত্তিসতার সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁরই জন্য লিখলাম আমার প্রথম চিত্রনাট্য। ইচ্ছা ছিল—উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি করবো। ভেবেছিলাম, সাময়িক-ভাবেই চিত্র-সমালোচনা করবো। কিন্তু ভাগ্যচক্রে তা'ই আমার পেশা হয়ে দাঁড়ালো, আর এমিলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হতে লাগলো।.........

এবার আমার কাহিনী সুরু করি :

পেশাদার চিত্র-সম্পাদক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেছি আমি, আর আমার দাম্পত্য-জীবনে অশান্তির বীজ উপ্ত হয়েছে। দু'টি ঘটনাই ঘটে যুগপৎ, আর ঘটনা দু'টি অবিচ্ছেদ্য।.........

অতীতের একটি ঘটনা মনে পড়ছে আজও। ঘটনাটিকে তুচ্ছ মনে করেছিলাম সেদিন। কিন্তু পরে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিলাম :

এমিলিয়া, বাত্তিসতা ও আমি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে শহরের মাঝখানে রাজপথের উপর দাঁড়িয়েছি। বাত্তিসতা প্রস্তাব করলেন, চলুন না, আজকের সন্ধ্যাটা আমার বাড়িতে কাটাবেন।......তাঁর প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হ'লাম। তিনজনেই এলাম বাত্তিসতার গাড়ির পাশে। লাল রঙের দামি গাড়ি, গাড়িতে দু'টি মাত্র 'সিট'। বাত্তিসতা নিজেই গাড়ির চালক। গাড়ির দরজা খুলে তিনি বললেন, কিছু মনে করবেন না, মিঃ মলটেনি...গাড়ীতে শুধু একজনের যায়গা হবে.........আপনাকে যে অন্য উপায় খুঁজতে হবে.........তা' আপনি বরং এখানে অপেক্ষা করুন......ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

এমিলিয়া দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। পরণে কালো রঙের বাঁধা গলা, হাত কাটা রেশমী জামা, হাতে ভাঁজ করা পশমী টুপি। অক্টোবর মাস, শীত পড়েনি তেমন। এমিলিয়ার দিকে চাইলাম। দেখলাম—তার প্রশান্ত সুন্দর মুখের উপর অস্থিরতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে, চোখ দু'টি হয়েছে চঞ্চল। বললাম, তুমি বাত্তিসতার সঙ্গে যাও, এমিলিয়া ……আমি ট্যাক্সি করে আসছি।

আমার দিকে চোখ তুলে চাইলো এমিলিয়া। অনিচ্ছা-জড়িত-কণ্ঠে বলল, মিঃ বাত্তিসতা যদি গাড়িতে যান, আর আমরা দু'জনে ট্যাক্সিতে যাই—

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাত্তিসতা বললেন, বাঃ বেশ লোক তো আপনি! আমায় একা একা যেতে বলছেন?

এমিলিয়া বলল, না না তা' নয়।

বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখখানি। মনে হলো—বিপন্ন বোধ করছে সে। তাই তাড়াতাড়ি বললাম: আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ বাত্তিসতা……আপনি ওর সঙ্গে যান, আমি ট্যাক্সিতে আসছি।

এবার হার মানলো এমিলিয়া। গাড়িতে উঠে বাত্তিসতার পাশে বসলো, গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো চঞ্চল ব্যাকুল দৃষ্টিতে। তার দৃষ্টিতে প্রকাশ পাচ্ছিল—অনুনয়, বিরক্তি ও অসহায়তা। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করেই সিন্দুকের ডালা বন্ধ করার মতো ভারী দরজাটি ঠেলে দিলাম।

গাড়ি চলে গেল। গভীর তৃপ্তিভরে আপনমনে শিস্ দিতে দিতে চললাম 'ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডের' দিকে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেশি দূর নয় বাত্তিসতার বাড়ি। ট্যাক্সিতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে না হলেও, একটু পরেই আমার পৌঁছে যাবার কথা।

কিন্তু কিছুদূর এসে চৌরাস্তার মাথায় দুর্ঘটনা ঘটলো। ট্যাক্সির সঙ্গে একটি প্রাইভেট গাড়ির ধাক্কা লাগলো। ড্রাইভাররা ব্যস্তভাবে গাড়ি থেকে নেমে এলো, দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো, ভিড় জমলো, পুলিশ এসে গাড়ির নম্বর ও ড্রাইভারদের নাম ঠিকানা লিখে নিল। নিশ্চিন্তে গাড়িতে বসে রইলাম আমি। আজ প্রাণভরে সুখাদ্য খেয়েছি। তা'ছাড়া, বাত্তিসতা বলেছেন, একটি চিত্র-সম্পাদনার কাজ দেবেন। তাই, স্ফূর্তির সীমা ছিল না আমার। দুর্ঘটনার ফলে পথে দশ-পনেরো মিনিট দেরী হলো।

বাত্তিসতার বৈঠকখানায় ঢুকে দেখলাম—পায়ের উপর পা দিয়ে একটি চেয়ারে বসে আছে এমিলিয়া। একটি চাকাওলা সুরাদানির উপর পা রেখে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছেন বাত্তিসতা। আমায় দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। এমিলিয়া ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ···এত দেরী হলো কেন? বললাম, দুর্ঘটনায় আটকা পড়েছিলাম। এমিলিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল, দুর্ঘটনা···কী দুর্ঘটনা? যা ঘটেছিল তার বর্ণনা দিলাম। একটু বিস্মিত ও লজ্জিত হলাম—বিনা প্রশ্নেই দুর্ঘটনার বিবরণ দিই নি বলে।

কিছু বললো না এমিলিয়া। বাত্তিসতা হেসে বললেন, এই নিন।··· টেবিলের উপর তিনটি গেলাস সাজিয়ে রেখেছিলেন তিনি। একটি তুলে দিলেন আমার হাতে। গল্প-গুজব ও হাস্য-পরিহাসে দু'ঘণ্টা কাটালাম। বাত্তিসতা ও আমার মধ্যেই ঠাট্টা-তামাসা চললো। স্ফূর্তির সীমা নেই বাত্তিসতার। লক্ষ্যই করলাম না—এমিলিয়া খুব প্রফুল্ল নয়। সে স্বভাবতঃই মুখচোরা, নির্জনতা-প্রিয় ও লাজুক। তাই তার গাম্ভীর্যে অবাক হলাম না একটুও। নির্বিকার ভাবে বসে রইল এমিলিয়া। একটিবারও চোখ তুলে কিংবা মুচকি হেসে আমাদের

আলাপ আলোচনায় যোগ দিল না। নীরবে বসে সিগারেট টানলো, সুরাপাত্রে চুমুক দিল—যেন সে এসেছে একা, কেউ নেই তার সঙ্গে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

নতুন একটি ছবি সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন বাত্তিসতা। বললেন, আমি চাই—আপনি এ ছবিতে কাজ করুন।

তিনি আমায় কাহিনীটি শোনালেন, চিত্র-নির্দেশক ও আমার সহযোগী চিত্র-সম্পাদকের পরিচয় জানালেন। বললেন, কাল আমার আপিসে এসে চুক্তিনামাটা করে যাবেন।···

বাত্তিসতা থামলেন এবার। মুহূর্তের নীরবতার সুযোগে উঠে দাঁড়ালো এমিলিয়া। বলল, এবার চল······বড় ক্লান্তি লাগছে—বাড়ি চল।

বাত্তিসতাকে অভিবাদন জানিয়ে উঠলাম। নীচে নেমে ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ড থেকে একটি ট্যাক্সি নিলাম।

বাত্তিসতার অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। তাই এমিলিয়াকে না জানিয়ে পারলাম না : ভাগ্যিস্, এ কাজটি ঠিক সময় পাওয়া গেল···নইলে কী হতো জানি না······ধার করতে হ'তো নিশ্চয়।

এমিলিয়া শুধু প্রশ্ন করলো : এক একটি চিত্র-সম্পাদনার জন্য কত পাও?

টাকার পরিমাণ জানিয়ে বললাম : তা'তে অন্ততঃ আগামী শীত পর্যন্ত অনায়াসে চলে যাবে আমাদের।

ট্যাক্সিতে উঠে এমিলিয়ার হাতখানি টেনে নিয়ে মৃদু চাপ দিলাম। প্রতিবাদ জানালো না সে।

বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত আর একটি কথাও বললো না এমিলিয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরদিন বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা করলাম, চুক্তিপত্র সই করে আগাম টাকা নিলাম।

মনে পড়ে—ছবির কাহিনীটি ছিল হাস্য-রসাত্মক। ভাব-সমৃদ্ধ কাহিনীর দিকেই আমার ঝোঁক। তাই ভেবেছিলাম, কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারবো না। কিন্তু চিত্র-সম্পাদনা করতে করতে দেখলাম—কাজটি বেশ ভালোই। সেদিনই চিত্র-নির্দেশক ও আমার সহযোগী সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় হয়।

বলতে পারি, বাত্তিসতার বাড়িতেই চিত্র-সম্পাদক হিসাবে আমার জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু সেদিন থেকেই যে পত্নী এমিলিয়ার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধে ও দাম্পত্য-জীবন বিষময় হয়ে উঠে, একথা জোর করে বলতে পারি না। তবে, সে-মুহূর্তেই আমার দুর্ভাগ্য ও বেদনার বীজ উপ্ত হয়েছিল বলা যায়। সে-ঘটনার অব্যবহিত পরে আমার প্রতি এমিলিয়ার আচরণে কোন পরিবর্তনের চিহ্ন প্রকাশ পায় নি। পরিবর্তনটা আসে পরের মাসে। কিন্তু জানি না, ঠিক কোন্ মুহূর্তে ও কেন, এমিলিয়ার মনের তুলাদণ্ড উল্‌টে গিয়েছিল।

বাত্তিসতার সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হতো তখন। প্রথম দিনের সন্ধ্যার অনুরূপ আরো বহু ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাগুলিকে আমল দিই নি সেদিন। কিন্তু পরে প্রায় সবগুলিই বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি :

প্রায়ই আমাদের নিমন্ত্রণ করতেন বাত্তিসতা। এমিলিয়া আমার সঙ্গে যেতে অনিচ্ছা জানাতো, আপত্তি করতো বার বার। এমন সব অজুহাত দিত যার সঙ্গে বাত্তিসতার বাড়ি যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

আমি বলতাম, তোমাকে ছাড়া কোথাও যাইনি আমি···বাত্তিসতা অসন্তুষ্ট হবেন···তাছাড়া, অপমান হবে আমাদের অন্নদাতার। অগত্যা রাজী হতো এমিলিয়া, হার মানতো আমার যুক্তির কাছে। তখন তাকে আবার প্রশ্ন করতাম, আমার সঙ্গে যেতে তোমার ভালো লাগে না বুঝি? তার উত্তর সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে এ প্রশ্ন করতাম না। আমার উদ্দেশ্য—যেন সে বুঝতে পারে যে তার নিজস্ব স্বাধীন মত রয়েছে, তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাই না আমি। সে স্পষ্ট ভাবে জবাব দিত, ভালো লাগবে না কেন? নিশ্চয় ভালো লাগে। তারপর বেরিয়ে পড়তাম দু'জনে।···

অবশ্যি, বিক্ষিপ্ত তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে স্মৃতি-মন্থন করে সাজিয়ে নিয়েছিলাম পরে। আগে শুধু জানতাম—আমার সঙ্গে এমিলিয়ার ব্যবহারে একটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তার কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করি নি। আকাশ পরিষ্কার থাকলেও যেমন বায়ুর পরিবর্তন ও গতি দেখেই আসন্ন বজ্রপাত ও ঝড়-বৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়, এও ঠিক তেমনি। মনে হতো, এমিলিয়া আগের চেয়ে কম ভালবাসে আমায়। বিয়ের পরে আমায় কাছে পাওয়ার জন্য সে যেমন ব্যাকুল হতো, আজ আর তেমন ব্যাকুলতা নেই তার। তখন বাইরে যাবার জন্য তৈরী হ'লেই অশ্রু-সজল হতো তার দু'টি চোখ; সে এমন ভাব দেখাতো—যেন আমি বাইরে না গেলেই সে খুশী হয়। এক একদিন এমন হতো যে বাইরেই যেতাম না, নয়তো সঙ্গে নিয়ে যেতাম এমিলিয়াকে। কিন্তু এখন সান্নিধ্যের চেয়ে আমার অনুপস্থিতিই যেন তার বেশি কাম্য, আমি কাছে না থাকলেই সে শান্তি বোধ করে।

একদিন ছিল, যখন এমিলিয়া বলতো—আমার অদর্শন তার অসহ্য। কী গর্বই না বোধ করতাম তখন! তার কষ্ট দেখে খুশী হ'তাম মনে মনে।

ভাবতাম, এই তো আমার প্রতি এমিলিয়ার গভীর প্রেমের নিদর্শন। কিন্তু যখনই দেখলাম—আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সে আর উদ্বিগ্ন হয় না, বরং আনন্দ বোধ করে, তখনই এক অব্যক্ত দুঃসহ বেদনা অনুভব করতে লাগলাম। যেন অতর্কিতে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে।.........

বিকেলেই কাজে বেরোবার কথা। কিন্তু এক একদিন সকালেও বেরিয়ে যেতাম—শুধু আমার প্রতি এমিলিয়ার ঔদাসীন্য যাচাই করে দেখবার উদ্দেশ্যে। বুঝতাম, আমার অনুপস্থিতিতে সে তৃপ্তি ও স্বস্তি বোধ করে। মনকে প্রবোধ দিতাম—বিয়ের দু'বছর পরে অনুরাগ হয়তো অভ্যাসের সঙ্গে মিশে যায়, স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি দাম্পত্য-সম্পর্কে কোন আবেগ থাকতে দেয় না।...তবু মনে হতো—না না, এ সত্য নয়। এ শুধু অনুভব করতাম, চিন্তা করতাম না এতটুকুও। কারণ, যা সত্য বলেই জানি, সে-সম্বন্ধে চিন্তা আর করবো কী? তার চেয়ে মনের গোপন অসনন্ধ অনুভূতিই যে বেশি সত্য হতে পারে।...আমার অদর্শনে কষ্ট পায় না এমিলিয়া।...সে হয়তো ভাবে—আমার অনুপস্থিতি অপরিহার্য...আমার উপর তার প্রেম কমে গেছে...হয়তো–সে আমায় একেবারেই ভালবাসে না।...আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা নেই আর।...নিশ্চয় এমন একটা কিছু ঘটেছে যার ফলে এমিলিয়া হারিয়েছে তার প্রেমাবেগ, অভাবনীয় একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।.........

যখন বাত্তিসতার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, তখন সম্পূর্ণ অচল না হলেও শোচনীয় ছিল আমার অবস্থা। উদ্ধারের পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।...একটি 'ফ্ল্যাট' 'লীজ' নিয়েছি, লীজের সম্পূর্ণ টাকা দিতে পারি নি, কোথায় টাকা পাবো ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

দু'টি বছর কাটিয়েছি ভাড়াটে বাড়িতে। এমিলিয়া ছাড়া আর কোন স্ত্রী হয়তো এই সাময়িক ব্যবস্থায় রাজী হতো না। স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল এমিলিয়ার। তাই রাজী হয়েছিল সে। সত্যিই, এমিলিয়া ছিল স্বভাব-গৃহিনী। কিন্তু গৃহের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল তীব্র। তাকে শুধু নারী জাতির স্বভাবজাত প্রবণতা বলা চলে না, এ—অনেকটা ক্ষুধার মতো দুর্বার একটা আগ্রহ। এ শুধু তার ব্যক্তিগত ক্ষুধা নয়। তার মূল ছিল এক বংশগত পরিবেশের মধ্যে। গরীবের ঘরে এমিলিয়ার জন্ম। আমার সঙ্গে যখন তার পরিচয় হয়, তখন সে ছিল "টাইপিষ্ট্"। সমাজে এমন একদল লোক আছে যারা উত্তরাধিকার-সূত্রে বঞ্চিত, ছোট একটি আশ্রয়-নীড় রচনার আকাঙ্ক্ষা যারা পূরণ করতে পারছে না পুরুষানুক্রমে। তাদেরই অন্তরের গোপন অপূর্ণ আশা যেন সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছিল এমিলিয়ার সুপ্ত বাসনার মধ্যে। জানি না, বিবাহের পরে তার স্বপ্ন সফল হবে—এ দুরাশা সে করেছিল কিনা। তবু, মনে পড়ে—দু'জনের বিয়ের কথা পাকাপাকি হ'বার পর যখন তাকে জানালাম—আমি তাকে নিজের ঘর দিতে পারবো না, একটি সজ্জিত কক্ষেই আপাততঃ সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে হবে, তখন তার দু'চোখ সজল হয়েছিল। কোনমতে অশ্রুসংবরণ করেছিল সে। ভেবেছিলাম—শুধু সাধের স্বপ্ন ভেঙে যাবার হতাশায় নয়, সেই স্বপ্নের আসল রূপ দেখেই অশ্রু জমেছে তার চোখে। স্বপ্ন তার কাছে অর্থহীন অলীক নয়, সেই স্বপ্নেই যে সে বেঁচে আছে!···

······প্রথম দু'টি বছর একটি সজ্জিত কক্ষে বাস করলাম। ঘরটিকে পরিষ্কার ঝকঝকে করে রাখতো এমিলিয়া। ছোট্ট একটি কক্ষে সীমাবদ্ধ থেকেও সে ভাবতো—নিজের বাড়িতেই বাস করছে। নিজের হাতে গুছিয়ে রাখতো জিনিসপত্র, ঘর মুছতো, শয্যা-রচনা করতো। সকালে

আগে-ভাগে ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে খাবার তৈরী করতো। তবু, তার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ঘরটি থাকতো ঠিক তেমনি—অপরের, তার নিজের নয়। দু'জনের জন্য মায়াপুরী গড়ার সাধ পূর্ণ হতো না এমিলিয়ার। মাঝে মাঝে শ্রান্ত নিরাশ হয়ে শান্ত অথচ স্পষ্টকণ্ঠে অনুযোগ করতো: এ দুঃসহ জীবনযাত্রা আর ক'দিন চলবে, বল?

জানতাম, তার এই অনুরাগের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সত্যিকারের বেদনা। মনে মনে সংকল্প করতাম—যেমন করে হোক, তার সাধ পূর্ণ করতেই হবে, সন্তুষ্ট করতে হবে এমিলিয়াকে।

অবশেষে একটি 'ফ্ল্যাট' "লীজ" নেবো ঠিক করলাম। সে-সঙ্গতি হয়নি তখনও। তবু, ভেবেছিলাম—এমিলিয়া কষ্ট পাচ্ছে, একদিন হয়তো সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করবে সে। কিছু টাকা পেয়েছিলাম, কিছু ধার করলাম, তারপর প্রথম কিস্তি শোধ করলাম। প্রিয়তমা পত্নীর জন্য আপন গৃহ রচনা করে লোকে যেমন তৃপ্তি পায়, তেমন তৃপ্তি পেলাম না আমি। পক্ষান্তরে, কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা শোধ করার চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলো মন। শুধু এমিলিয়ার জন্যই এমন অবিবেচনার কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। তাই তার উপর বিতৃষ্ণা এলো।...

যা হোক্, এমিলিয়াকে জানালাম: সব ঠিক হয়ে গেছে।.........

যেদিন নতুন ফ্ল্যাটে গেলাম সেদিন এমিলিয়ার আবেগ দেখে নিজের চিন্তা ভুলে রইলাম কয়েকদিন।

বলেছি, গৃহ-রচনার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ছিল এমিলিয়ার মনে। আমার হৃদয়তন্ত্রীতেও ধ্বনিত হলো তার সুর। মনে হলো, এই ফ্ল্যাটটি যোগাড় করে এমিলিয়ার চোখে প্রিয়তর হয়ে উঠেছি। দেহের দিক থেকে আরও কাছে এসেছি, আরও অন্তরঙ্গ হয়েছি তার।.........

দু'জনে মিলে ফ্ল্যাটটি দেখতে গেলাম। নির্জন, স্যাঁৎসেতে ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলো এমিলিয়া। তাকে বললাম, কোন্ ঘরটি কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবো, কীভাবে সাজাবো।

ঘর দেখা শেষ হলো। জানালাটি খুলে বাইরের দৃশ্য দেখবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার গায়ে ঠেস দিয়ে এমিলিয়া চুপি চুপি বলল, একটি চুমো খাও না।···প্রেম-নিবেদন ব্যাপারে সে সর্বদাই সতর্ক ও লাজুক। তার এই অপ্রত্যাশিত অভিনব আচরণে ও কণ্ঠস্বরে উত্তেজিত হয়ে চুম্বন করলাম তাকে। সে আমায় জড়িয়ে ধরলো, জোরে চাপ দিল, আরো কাছে এলো, সেমিজ ও বডিজের বোতাম খুলে আমার পেটের উপর রাখলো তার পেটটি। চুম্বন-পর্ব শেষ হবার পর অস্পষ্ট নিশ্বাসের মতো স্বচ্ছ অথচ সুশ্রাব্য কণ্ঠে সে যেন আমায় বলল—হয়তো আমার মনে হলো তাই—'এসো'।···

তার দেহের ভারে মেঝের উপর পড়ে যাচ্ছিলাম আমি।···

মাটিতে, ধুলোমাখা টালির স্তূপের উপর, যে জানালাটি খুলতে যাচ্ছিলাম তারই গোবরাটের নীচে চললো আমাদের প্রেমলীলা।

এমিলিয়ার অসংযত অনভ্যস্ত আলিঙ্গনের আকুলতার মধ্যে আমার উপর তার ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করলাম। বুঝলাম—তার আকস্মিক কামাবেগের ভিতর দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে একটি নিরাপদ আশ্রয় স্থাপনের জন্য অন্তরের সুপ্ত বাসনা। ধূলিধূসর মলিন মেঝেয়, নির্জন ফ্ল্যাটের অন্ধকারে সেই নিবিড় আলিঙ্গনে সে আত্মদান করেছে তার গৃহদাতাকে,—স্বামীকে নয়। ফাঁকা ঘরগুলির রঙ ও চুণ-বালির গন্ধে রোমাঞ্চ জেগেছিল তার দেহে, পুলক প্রবাহ ছুটেছিল অন্তরের অন্তঃস্তলে। আদর-সোহাগ-প্রেমে তার দেহ-মনে এমন উত্তেজনা জাগানো সম্ভব নয়।

নতুন গৃহ-প্রবেশের পর দু'মাস কেটে গেছে। এমিলিয়ার নামেই চুক্তিপত্র করেছি। তার কারণ—আমি জানতাম, তাই সে চায়। সীমাবদ্ধ আমার আয়। তবু, ছোটোখাটো দু'একটি আসবাব-পত্র কেনা হয়েছে। প্রথম আবেগ কেটে গেছে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা জেগেছে মনে। ভদ্রভাবে বাস করার মতো আয় করছি। এমনকি, কিছু কিছু সঞ্চয়ও করতে পারি ইচ্ছে করলেই। কিন্তু সেই সামান্য সঞ্চয় থেকে ফ্ল্যাটের কিস্তির টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তা'ছাড়া, মুশকিল এই যে এমিলিয়াকে সেকথা জানাবার উপায় নেই। তার মনের আনন্দটুকু তো কেড়ে নিতে পারি না! তবু, এ সময় থেকেই এমিলিয়ার প্রতি আমার প্রেমের তীব্রতা কমতে থাকে। এমিলিয়া জানে আমার অবস্থার কথা। কিন্তু আমার দুশ্চিন্তায় সে মাথা ঘামায় না। ঘর সাজানো নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে সে। আমার মনের অশান্তি ও উদ্বেগের দিকে কোন খেয়ালই নেই তার। আমি বিব্রত, বিপন্ন, চিন্তাগ্রস্ত—অথচ সে নির্লিপ্ত, নির্বিকার। এ তো তার স্বার্থপরতা—হয়তো, অবিবেচনা।.........

মনের পটে নিজের যে মূর্তিটি এঁকেছিলাম তার রূপ বদলে গেল এই দুর্ভাবনায়। মনে করতাম—আমি একজন সংস্কৃতিবান, রুচিশীল, বিচক্ষণ, বিদ্বান ব্যক্তি; নাটক রচনার দিকেই আমার ঝোঁক। মনের সেই ছবিটি দেহের উপরও প্রতিফলিত হয়েছিল। ভাবতাম—আমি তরুণ; রোগা পাতলা চেহারা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, মানসিক চাপল্য, ময়লা পোশাক-পরিচ্ছদ ও উদাসীনতা যেন আমার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক গৌরব সূচনা করছে।

কিন্তু সেদিন নির্মম চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় সেই সম্মোহন মূর্তিটি দেখতে পেলাম না আর। দেখলাম: এক নিঃস্ব শয়তান ফাঁদে পড়েছে,

পত্নী-প্রেম উপেক্ষা করতে না পেরে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। মর্মন্তুদ বেদনার সঙ্গে কতদিন তাকে সংগ্রাম করতে হবে—কে জানে?

দৈহিক রূপান্তরও লক্ষ্য করলাম: আমি আর তরুণ, অখ্যাত প্রতিভাবান নাট্যকার নই—একজন দরিদ্র সাংবাদিক, সস্তা দ্বিতীয় শ্রেণীর সাময়িক-পত্রের সমালোচক; হয়তো, কোন সরকারী কিংবা সদাগরী আপিসের সাধারণ একজন কেরানী—যে তার পত্নীকে প্রফুল্ল রাখবার জন্য নিজের দুর্ভাবনা তার কাছে প্রকাশ করে না, সারাদিন অর্থের সন্ধানে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়, দেনার দুশ্চিন্তায় রাত্রিতে ঘুমোতে পারে না, শুধু টাকা ছাড়া আর কিছু চোখে দেখে না, অর্থচিন্তা ছাড়া আর কোন ভাবনা নেই তার মনে।.........

বড় করুণ এ মূর্তি—বিবর্ণ, মলিন, মর্যাদাহীন।

এ যে একজন হতভাগ্য সাহিত্যিকের জীবনের একটি মামুলি চিত্র!

ঘৃণায় অন্তর ভরে উঠলো। কালক্রমে সবই নষ্ট হয়ে যাবে আমার। এই হবে আমার পরিণতি! তবে, হ্যাঁ—একটা কথা: আমার পরিণীতা পত্নী ধারণাই করতে পারে না যে আমার অভিরুচি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখের সমভাগিনী হ'তে পারে না সে। আমার পত্নী সুন্দরী অশিক্ষিতা টাইপিষ্ট্। তার মধ্যে হয়তো রয়েছে তার শ্রেণীগত সংস্কার ও উচ্চাভিলাষ। সে যদি আমায় ঠিক বুঝতে পারতো—তা'হলে নাট্যকার হিসাবে সাফল্যের আশায় দীনভাবে কোন ষ্টুডিও-তে কিংবা সুসজ্জিত কক্ষে বিশৃঙ্খল কষ্টকর জীবন-যাপনের বেদনা অম্লান বদনে বরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমার স্ত্রী চায় তার নিজের একটি গৃহ। তার জন্য গৃহ নির্মাণ করতে হবে—বাঁধতে হবে ঘর। হতাশায় মন ছেয়ে গেল। হয়তো তারই জন্য আমার সাহিত্যিক হবার আশা

ছাড়তে হবে। তাই আরো বেড়ে গেল আমার বেদনা ও অসহায়তার মাত্রা। অনুভব করলাম—যেমন আগুনের শিখায় পুড়ে লোহার টুকরো নরম করে বাঁকানো যায়, ঠিক তেমনি দুঃখের দহনে ক্রমশঃ কোমল ও অবনমিত হয়ে পড়েছে আমার অন্তর। যারা ধনী ও বিশেষ অধিকারভোগী, যারা এমন দুঃখ ভোগ করে না, তাদের উপর ঈর্ষা হলো আমার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই ঈর্ষার ভাব ব্যক্তি বা অবস্থা-বিশেষের সীমা ছাড়িয়ে গেল। দারিদ্র্যের প্রতি আমার বিদ্বেষ সকলের উপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকার ধারণ করলো। এ বিদ্রোহ শুধু আমার নিজের উপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে নয়, যারা আমার মতো অনর্থক কষ্ট পাচ্ছে তাদের সকলের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে।

আমার মনের চিন্তা একই পথ অনুসরণ করছিল বরাবর, লক্ষ্য ছিল শুধু একটি। তাই আমার অন্তরের ঘৃণা, কল্পনা ও মনের এই অদৃশ্য রূপান্তর সম্বন্ধে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ সচেতন। অনুভব করলাম, যে সব রাজনৈতিক দল সমাজের দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তাদের প্রতি সমবেদনাকুল হচ্ছে আমার মন। হয়তো, আমার দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী—সমাজ। এই সমাজ তার যোগ্যতম সন্তানদের পঙ্গু করে রেখেছে, পোষণ করছে অযোগ্যদের। সাধারণতঃ যারা অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয়, সভ্য ও সরল—তারা জানে না একথা। চেতনার গহনে এক রহস্যময় রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে স্বার্থনীতি পরোপকারের রূপ নেয়, ঘৃণা প্রেম হয়ে ফুটে ওঠে, আশঙ্কা দুর্জয় সাহসে পরিণত হয়। কিন্তু নিজের উপর নজর রেখেছিলাম আমি, পরীক্ষা করছিলাম নিজেকে। তাই সুস্পষ্ট দৃশ্যমান ছিল সবই। আমি যেন অপর লোককে দেখছি—নিজেকে নয়। তবু জানতাম—নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত করছি। যুদ্ধোত্তর-যুগে

সবাই যেমন করতো ঠিক তেমনি, কোন রাজনীতিক দলের সদস্য হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতাম না আমি। আমার মনই ছিল আলাদা। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু এ কী? আমার চিন্তাধারা, কথাবার্তা ও আচরণ ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে যেন। বিরক্ত হয়ে উঠলাম তাই।.........সাধারণের সঙ্গে কি আমার কোন তফাৎ নেই? মানব-জগতের নব-জন্মের স্বপ্ন দেখতে হলে কি বিত্তহীন না হলে চলে না?...... ...

আমার এক বন্ধু কিছুদিন ধরে আমার পেছনে ঘোরাঘুরি করছিল। এক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে সে বিশ্বাস জাগালো আমার মনে। কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হলাম আমি। পরক্ষণেই বুঝলাম—তরুণ অখ্যাত প্রতিভাধরের যোগ্য কাজ করিনি আমি, দরিদ্র বুভুক্ষু সাংবাদিক কিংবা মসীজীবীর মতোই কাজ করেছি। কিন্তু যা' হবার তা' তো হ'য়ে গেছে। একবার পার্টিতে যোগ দিলে আর বেরিয়ে আসা যায় না।

এ সংবাদ শুনে এমিলিয়া বলেছিল: এখন শুধু কম্যুনিষ্টরাই তোমায় কাজ দেবে, আর সবাই 'বয়কট্' করবে। তাকে জানাবার ইচ্ছা হলো—তোমায় খুশী করবার জন্য ফ্ল্যাটটি না নিলে 'কম্যুনিষ্ট' হ'তে হতো না।...

কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে পারলাম না।

ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে গেল।

আমরা নতুন বাড়িতে গেলাম। পরের দিন দৈবক্রমেই যেন বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমায় একটি চিত্র-সম্পাদনার কাজে অহ্বান জানালেন। শান্ত হ'লো মন, এতটুকু প্রফুল্ল বোধ করলাম দীর্ঘদিন পরে। ভাবলাম, চার-পাঁচটি চিত্রনাট্য লিখে ধার শোধ

করে নিশ্চিন্ত হবো। তারপর সাংবাদিকতা করবো, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ করবো।.........

ইত্যবসরে এমিলিয়ার উপর আমার প্রেম আরো নিবিড় হ'য়ে উঠলো।

তাকে স্বার্থপর, অবিবেচক ও নির্লজ্জ ভেবেছিলাম। তাই ক্ষুণ্ণ হলাম, ধিক্কার দিলাম নিজেকে।

কিন্তু বেশিদিন কাটলো না এ অবস্থায়। মনের আকাশে জমলো এক টুকরো মেঘ—গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।.........

তৃতীয় অধ্যায়

বাত্তিসতার সঙ্গে আমার দেখা হয় অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবারে। তার আগের দিন নতুন ফ্ল্যাটে এসেছি আমরা। ঘরগুলি সাজানো হয়েছে। ফ্ল্যাটটি সত্যিই বড় নয়, জমকালোও নয়। দু'খানি মাত্র ঘর—একটি বড়, অপরটি চলনসই। বাথরুম, রান্নাঘর ও চাকরের শোবার ঘর আধুনিক ফ্ল্যাটের মতোই—খুব ছোট। তা'ছাড়া, ছোট্ট বাক্সের মতো খানিকটা খালি যায়গা রয়েছে। এমিলিয়া ঠিক করেছে তার প্রসাধন-কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করবে সেটি। অপরিসর রাস্তার উপর তৈরী নতুন বাড়ির দোতালায় আমাদের ফ্ল্যাটটি; কিন্তু বেশ ঝকঝকে। বাড়ির বাইরে একটি ছায়া-ঘন বাগানবাড়ি, ভিতরে আঁকা-বাঁকা পথ, ফোয়ারা, কুঞ্জ, মাঝে মাঝে ফাঁকা। সামনে রাস্তা নেই, বাড়িটির সংলগ্ন কোন প্রাচীর নেই। ইচ্ছে করলেই নিচে নেমে যখন খুশী বাগানে বেড়িয়ে আসতে পারি।

এসেছিলাম বিকেলে। সারাদিন কেটেছিল ব্যস্ততায়। মনে নেই—সেদিন কোথায় খেয়েছিলাম, আমাদের সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা। শুধু মনে পড়ে: রাত্রিতে শোবার ঘরের মাঝখানে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে নেকটাই খুলছি। হঠাৎ আরশির ভিতর দিয়ে দেখলাম—একটি বালিশ নিয়ে পাশের ঘরের দিকে যাচ্ছে এমিলিয়া। অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, ও কী করছ তুমি?

নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েই কথাগুলি বললাম। দরজা অবধি গিয়ে ফিরে এলো এমিলিয়া। বলল, আচ্ছা আমি যদি ও-ঘরে ঘুমোই, কোন আপত্তি নেই তো তোমার?

অবাক হলাম তার প্রশ্নে। কোন চিন্তা না করেই বললাম, শুধু আজকের রাত্রিটার কথা বলছ কি?

: না, রোজই। বিশ্বাস কর, এজন্যই তো নতুন বাড়ি খুঁজছিলাম··· খড়খড়ি খোলা রেখে তোমার মতো নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি না আমি। মোরগের ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে যায়···আর ঘুম আসে না··· সারাদিন মাথা ধরে থাকে। তুমি কিছু মনে করবে না নিশ্চয়? আমার তো মনে হয়—দু'জনের আলাদা থাকাটাই ভালো।

বুঝতে পারলাম না তার ইংগিত। এ আবার কী কথা? সামনে এসে বললাম, না, তা' হতে পারে না—পারে না······আলাদা শোবে কেন? বিছানায় না শুয়ে গদির উপর শোওয়া আরামের নয় নিশ্চয়······ আর, তোমার অসুবিধার কথা আগে তো কখনও বলনি আমায়।

চোখ দু'টি নামিয়ে আমার দিকে না তাকিয়েই সে বলল, সাহস হয়নি।

বললাম, দু'বছরের মধ্যে অন্ততঃ একদিনও তো বলতে পারতে! আমি ভেবেছিলাম, তোমারও অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

সে যেন খুশি হলো। মাথা তুলে বলল, না—অভ্যাস হয়নি··· একেবারেই ঘুম হয় না আমার······আর—

কথা শেষ না করেই যাবার জন্য পা বাড়ালো সে। বললাম, দাঁড়াও······আচ্ছা বেশ—এবার থেকে খড়খড়ি বন্ধ করেই ঘুমাবো।

পরক্ষণেই বুঝলাম, তাকে ভালবাসি বলেই একথা বলিনি। বলেছি—তাকে পরীক্ষা করবার জন্য। ঘাড় নেড়ে ম্লান হাসি হেসে সে বলল, না না লক্ষীটি, তুমি কেন আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করতে যাবে? তুমি তো বল, খড়খড়ি বেঁধে রাখলে তোমার দম আটকে যায়···তাই বলছি—

···সত্যি বলছি, আমার বেশি অসুবিধে হবে না···দু'দিন গেলেই অভ্যাস হয়ে যাবে···তোমার জন্য ওটুকু ত্যাগ স্বীকারই করলাম না হয়।

একটু ইতস্ততঃ করে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, না-না, কম হোক্ বেশি হোক, অসুবিধে হবে কেন? তুমি কেন ত্যাগ স্বীকার করবে? ও-ঘরেই শোব আমি।

: যদি বলি—আমি সেটা পছন্দ করি না—তোমাকে আমার সঙ্গেই রাখতে চাই?

মুচকি হেসে স্বভাব-শান্ত কণ্ঠে এমিলিয়া বলল, এ আবার নতুন কী কথা? দু'টি বছর হ'লো আমাদের বিয়ে হ'য়েছে। তখন তুমি এটুকু কষ্ট স্বীকার করতে চাওনি, এখন চাইছ······তোমার তাতে ক্ষতি কী? কত স্বামী-স্ত্রীই তো আলাদা থাকে, তা'তে তো তাদের প্রেম অক্ষুণ্ণই থাকে দেখেছি। ···সকালে তোমার খুশিমতো কাজে বেরোতে পারবে, জাগিয়ে দিতে হবে না আমায়।

: কিন্তু এক্ষুণি তুমি বললে—মোরগের ডাক শুনে তোমার ঘুম ভেঙে যায়···অত সকালে তো কাজে বেরোই না আমি।

অধীর হ'য়ে উঠলো এমিলিয়া। বলল: উঃ—তুমি যে কী! উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।......

বিছানার উপর বসে পড়লাম। একটি বালিশ উধাও হয়েছে। তা'তেই বোঝা যাচ্ছে—ছাড়াছাড়ি হয়েছে দু'জনের, একা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি আমি। বিস্মিত বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলাম—এমিলিয়া যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছে সেদিকে।

মনে প্রশ্ন জাগলো: দিনের আলোয় ঘুম ভেঙে যায় বলেই কি এমিলিয়া আমার সঙ্গে এক শয্যায় শুতে চায় না, না কি আমার সঙ্গে থাকতেই চায় না আর?

হয়তো, দ্বিতীয় কারণটিই ঠিক। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম—প্রথমটি সত্য হোক।...সত্যিই কি তবে এমিলিয়া ভালবাসে না আমায়?.........

চিন্তার সমুদ্রে ডুবে আছি। এঘর-ওঘর যাওয়া-আসা করছে এমিলিয়া। অক্টোবর মাসের সুরু। শীত পড়েনি। এমিলিয়ার গায়ে একটি পাতলা রেশমী সেমিজ।

এখানে এমিলিয়ার দৈহিক গঠন বর্ণনা করা দরকার: হয়তো দীর্ঘাঙ্গী ছিল না এমিলিয়া, কিন্তু তাকে আর সব মেয়ের চাইতে লম্বা ও বড়-সড় মনে হতো আমার। জানি না, তা'র চোখ দু'টি আসলেই বড় ছিল, না আমার চোখে তেমন দেখাতো। পরিণয়-রাত্রিতে আলিঙ্গন করেছিলাম তাকে। সে ছিল খালি গায়ে। দেখেছিলাম—তার কপালটি আমার বুকের একটু উপরে ঠেকেছে—দু'টি সুন্দর কাঁধ ও মাথাটির মাপে আমি তার চেয়ে লম্বা, তার বাহু দু'টি সুদৃশ্য—গোলগাল, গায়ের রঙ ময়লা, নাকটি বেশ ধারাল ও স্পষ্ট, মুখখানি তাজা—হাসিখুশি, শুভ্র উজ্জ্বল দন্তপাটি ভিজে লালায় জলজল করছে, ঠোঁট দুটি মসৃণ, চোখের দৃষ্টিতে

কামনা ফুটে উঠেছে। নিখুঁত ছিল না তার দেহের গড়ন। তবু, কোন অজ্ঞাত কারণে তাকে সুন্দরী মনে হতো আমার—বেশ সরু কোমরটি, নিতম্ব ও বুক সুগঠিত, পা দু'টি দীর্ঘ, ঋজু ও বলিষ্ঠ। সত্যিই, তার মধ্যে ছিল এক অপূর্ব কমনীয়তা, রহস্যময় বর্ণনাতীত সহজাত গাম্ভীর্য।……

……চেয়ে আছি তার দিকে। ভেবে পাচ্ছি না—কী করবো। তার মুখ ও দেহের উপর আনাগোনা করছে আমার চঞ্চল দৃষ্টি। পাতলা সেমিজের ভিতর দিয়ে তার দেহের বর্ণ ও বুকের গঠন কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়লো, সে আমায় ভালবাসে না আর! সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো—তার সঙ্গে আমার দৈহিক মিলন সম্ভব নয়। স্তম্ভিত, স্তব্ধ হয়ে রইলাম। এ যে বিশ্বাসই করা যায় না! প্রেম তো শুধু একটি মানসিক বৃত্তি নয়, অনবদ্য ও স্বাভাবিক দৈহিক মিলনও বটে। এতদিন এমিলিয়ার মন না জেনেই উপভোগ করেছি সে-মিলন। এখন যেন এই সুস্পষ্ট অথচ গোপন সত্য চোখের সামনে আরো স্পষ্ট হলো। আমাদের মিলন অব্যাহত থাকবে না,—নেইও!

কেউ যখন হঠাৎ জানতে পারে যে সে এক অতলস্পর্শ গহ্বরের উপর ঝুলছে, তখন তার অবস্থা যেমন হয় আমারও হলো ঠিক তেমনি। অকারণে ছিঁড়ে গেছে প্রেমের বাঁধন, বিচ্ছেদ ও বিরহ ঘিরে আসছে জীবনে। তীব্র ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও বেদনায় অন্তর ভরে উঠলো।………

এমিলিয়া যাচ্ছিল আমার সামনে দিয়ে। খপ্ করে তার হাতখানি ধরে ফেললাম। বললাম, এসো……কথা আছে তোমার সঙ্গে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার বৃথা চেষ্টা করলো সে। অদূরে বিছানার উপর বসলো। বলল, আমার সঙ্গে কথা আছে……কী কথা?

আমাদের মধ্যে এমন ভাব ছিল না আগে। তাই এ উৎকণ্ঠা বা লজ্জা অনাগত আসন্ন পরিবর্তনকে স্পষ্টতর নিশ্চিততর করে তুললো।

বললাম, হ্যাঁ···তোমার সঙ্গে কথা আছে। মনে হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কী যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে।

আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে সহজ ভাবে সে বলল, কী যে বল তুমি —বুঝতে পারি না। কী পরিবর্তন হলো আবার? দু'জনেই তো ঠিক আগেকার মতোই রয়েছি।

: আমি ঠিক তেমনিই আছি···কিন্তু বদলে গেছ তুমি।

: একটুও না। আমি এখনও সে-আমিই রয়েছি।

: আগে এর চেয়ে বেশি ভালবাসতে তুমি আমায়··· · যখন তোমায় একা রেখে বেরোতাম, তখন ব্যথা পেতে······আমার সঙ্গে এক শয্যায় ঘুমোতে আপত্তি করতে না আজকের মতো ···

: ওঃ এ কথা! ·····আমি জানতাম—এমন একটা কিছু ভাবকে তুমি। ······কিন্তু, বল তো—কেন এমনি করে নিজেকে কষ্ট দাও? তোমার সঙ্গে এক বিছানায় থাকতে চাই না কেন, জান? সত্যিই, ঘুমোতে চাই আমি······তোমার সঙ্গে থাকলে ঘুম হয় না। তাই—···

এ কী? আমার যুক্তি ও বিদ্বেষ যেন আগুনের শিখায় মোমের মতো গলে গেছে। আমার পাশে রয়েছে এমিলিয়া। গায়ে পাতলা কুঁচকানো সেমিজ, সেমিজের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ছে তার দেহের সুপরিচিত গোপন বর্ণ ও আকার। কামনা জেগে উঠলো মনে। রোমাঞ্চিত হলো সর্বাঙ্গ।······

কিন্তু আমার দুর্বার কামনা শুধু আমাকেই তার দিকে টেনে নেবে কেন? তার দেহ-মনেও অনুরূপ কামনা জেগে উঠবে না কেন? কেন?

নীচু স্বরে বললাম, বেশ তো···কিছুই যদি না বদলে থাকে—তার প্রমাণ দাও।

: প্রতি দিন—প্রতিটি মুহূর্তেই তো প্রমাণ দিয়ে আসছি।

: এখনি—এই মুহূর্তে প্রমাণ চাই।

ঝুঁকে পড়লাম তার দিকে। দুর্বার বিক্রমে তার চুল ধরে মাথাটি নামিয়ে চুমো খেতে চাইলাম।

প্রথমে আপত্তি করলো না সে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মাথাটি সরিয়ে নিয়ে এড়িয়ে গেল আমার চুম্বন। আমার ঠোঁট দু'টি তার ঘাড় স্পর্শ করলো। তাকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, তুমি কি চাও না—আমি তোমায় চুমো খাই?

মাথার চুলের উপর হাত বুলাতে বুলাতে সে বলল, না—তা নয়… শুধু একটি চুমো হলে আপত্তি ছিল না……কিন্তু তুমি তো তার পরেও ছাড়বে না……আর…অনেক রাত হ'য়ে গেছে আজ।

বিজ্ঞের মতো কথা বলছে এমিলিয়া। হতাশ হয়ে পড়লাম তাই। বললাম, এতে আবার সময় অসময় কী?

তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে চাইলাম আবার। সে বলে উঠল : উঃ—লাগছে!

আশ্চর্য! তাকে একটু স্পর্শ করেছি মাত্র। আগে জোরে চেপে ধরতাম। কিন্তু অমন করতো না সে। রাগ হলো তাই। বললাম, আগে তো তোমার লাগতো না এতে।

: তুমি জান না……লোহার মতো শক্ত তোমার দু'টি হাত…

ক্লান্তভাবে কথাগুলি বলল এমিলিয়া। দেখলাম, তার উক্তির মধ্যে কৌতুকের লেশমাত্র নেই।

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, তবে—চুমো খেতে দেবে না?

: এসো……এই যে…এসো না…

সামনের দিকে নুয়ে পড়ে আমার ভুরুর উপর একটি চুমো খেলো সে। বলল, এবার ঘুমোইগে…কেমন?……রাত হয়েছে অনেক।

ক্ষান্ত হ'লাম না তা'তে। তা'র নিতম্বের নিচে হাত রেখে বললাম, এমন চুমো তো তোমার কাছে চাইনি এমিলিয়া।

জড়িয়ে ধরলাম তাকে।

আমায় হাত দিয়ে ঠেলে দিল সে। রুক্ষকণ্ঠে বলল, আঃ—ছাড় না··· লাগছে !······

তার গায়ের উপর ভর দিয়ে চুপি চুপি বললাম, না না না, লক্ষ্মীটি··· তোমার এ কথা সত্যি নয়—সত্যি নয়।

একটি হেঁচকা টান দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল এমিলিয়া।

বলল : কী করবে করে নাও তাড়াতাড়ি······অমন করে ব্যথা দিয়ো না আর······ও-ভাবে চেপে ধরলে আমার দম বন্ধ হ'য়ে যায়······

বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। তার কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেয়েছে চরম উদাসীনতা। এতটুকু আবেগ নেই তা'তে।

হাতের উপর হাত রেখে মাথাটি নিচু করে শয্যার উপর বসে রইলাম নিশ্চল ভাবে।

একটু পরে আবার শুনলাম তার কণ্ঠস্বর : এসো······যখন কিছুতেই ছাড়বে না······কি বল ?

মাথা না তুলেই অস্পষ্ট স্বরে বললাম, নিশ্চয়।

কিন্তু সম্ভোগ-বাসনা ছিল না আমার। এই নতুন বিচ্ছেদ শেষ পর্যন্ত সহ্য করবার চেষ্টা করলাম।

এমিলিয়া বলল, বেশ ! ···এসো তবে······

ঘরের ভিতর একটু পায়চারি করে আমার বিছানার চারদিকে ঘুরলো সে। তারপর দেখলাম, সে সেমিজ খুলছে। মনে পড়লো—এই আয়োজন পর্বটি কেমন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতাম আগে। যেন

রূপকথার দস্যু দেখছে—যাদুমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাচ্ছে গুহার দ্বার···অদৃশ্য মহামূল্য রত্নরাজীর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে চারদিক। কিন্তু আজ তেমন কৌতূহল হলো না। আজ দেখলাম অন্য দৃষ্টিতে। এ দেখার মধ্যে নির্মল আনন্দ নেই। কেন? কারণ এমিলিয়া আজ উদাসীন, উভয়ে উভয়ের উপর নির্মম হয়েছি, দু'জনেই হয়েছি দু'জনের অযোগ্য।

কোলের উপর হাত রেখে মাথাটি নিচু করে উপুড় হয়ে রইলাম। একটু পরে খাটের স্প্রীং-এ খট্ করে একটি শব্দ হলো। বেড্-কভারটি না তুলেই বিছানায় শুয়ে পড়লো এমিলিয়া। আর একটি শব্দ হলো—যেন একটু সরলো। তারপর আমায় ডাকল, এসো না····· আর দেরী করছ কেন?

নড়লাম না। ভাবলাম—এই কি আমাদের স্বাভাবিক জীবন? হ্যাঁ, অনেকটা তাই। জামা খুলে বিছানায় এসে শোয় এমিলিয়া। ঠিক এমনি করেই আহ্বান করে আমায়। তবু, সবই যেন বদলে গেছে। এর আগে তা'র এমন নির্লিপ্ত বশ্যতা-স্বীকার চোখে পড়েনি। আগে সব কিছু হতো নিমেষে—সহজাত উত্তেজনার সঙ্গে, নিবিড়ভাবে। টেরই পেতাম না—কখন, কেমন করে ধরা পড়তাম এমিলিয়ার বাহুবন্ধনে। আজ এমিলিয়ার সে-আকুলতা ও বিশিষ্টতা নেই,—আমারও নেই। তখন দৈহিক উত্তেজনার মধ্যেও নীরবে লক্ষ্য করতাম এমিলিয়ার গতি। সেও ঠিক তেমনিভাবেই দেখতো আমায়। কিন্তু আমি যেন আজ আমার প্রিয়তমা পত্নীর মুখোমুখি বসে নেই; বসে আছি—এক চপলা রূপ-পসারিণীর সঙ্গে। সে আমার বাহু-বন্ধনে ধরা দিতে প্রস্তুত হচ্ছে, ভাবছে—ক্ষণস্থায়ী সে-আলিঙ্গন ক্লান্তিকর হবে না এতটুকু। মুহূর্তের জন্য দেখলাম এমিলিয়াকে: ঠিক যেন একটি অপচ্ছায়া।

শয্যায় শায়িতা এমিলিয়ার সঙ্গে ছায়ামূর্তিটি যেন মিশে একাকার হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়ালাম। মুখ না ফিরিয়েই বললাম, কিছু মনে করো না··· আজ থাক, আমি ও-ঘরে গিয়ে ঘুমোচ্ছি······তুমি এখানে থাক······

পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গেলাম। বিছানা পাতাই ছিল। এমিলিয়ার জামা-জুতো এনে শোবার ঘরে একটি চেয়ারের উপর রাখলাম।

একবার তার দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। একটু আগে সে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনিই রয়েছে। তার গা খালি, একটি বাহু কাঁধের পেছনে, মাথাটি আমার দিকে, দু'টি চোখ খোলা, দৃষ্টি শূন্য, বুকের উপর আর একটি বাহু।

এবার মনে হলো—সে রূপ-পসারিনী নয়—আলেয়া······তার চারদিকে ঘন কুয়াশার আবরণ······সে চলে গেছে আমার কাছ থেকে বহু দূরে—বাস্তব সীমানার বাইরে, আমার অনুভূতির গণ্ডীর ওপারে।······

চতুর্থ অধ্যায়

দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে যেন। কিন্তু এমিলিয়ার ব্যবহারে তার পরিচয় পেলাম না। নির্লিপ্ত, নির্বিকার হয়ে গেছে সে। জোর করে তার ভালবাসা আদায় না করাই আমার উচিত। তবুও ভালবাসতে লাগলাম তাকে।

প্রেমের একটা আশ্চর্য শক্তি আছে। প্রেম শুধু মোহ আনে না, বিস্মৃতিও আনে। কেন জানি না—পরের দিন রাত্রির ঘটনার গুরুত্ব

কমে গেল আমার কাছে, বিদ্বেষভাব কেটে গেল। মনে হলো—ও একটা মতানৈক্য ছাড়া আর কিছু নয়। আসল কথা, ইচ্ছা থাকলেই ভোলা যায় সব। তা'ছাড়া, এমিলয়াই হয়তো আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করছিল। একা থাকতে চাইতো সে, কিন্তু আমায় দেহ-দান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো না; তবে তেমনি নিষ্ক্রিয় থাকতো। তাই বিদ্রোহী হয়েছিল মন। ক'দিনের মধ্যে তা'ও সয়ে গেল, এমন কি তৃপ্তিকর মনে হলো। সেই রাত্রিতে রূপ-পসারিণীর মতো ব্যবহার করেছিল এমিলিয়া। কিন্তু মাত্র কিছুদিন আগেও তো ঠিক সে-অবস্থায় তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ করতে আপত্তি করতাম না। ভয় করছিলাম—সে বুঝি আমাকে চায় না আর। তবু, তার ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য কৃতজ্ঞ হ'লাম তার কাছে।

যদি ভাবতাম—এমিলিয়া আমাকে আগের মতোই ভালবাসে, কিংবা যদি আমাদের প্রণয়ের প্রশ্ন না তুলতাম, তা'হলে উপলব্ধি করতে পারতাম—আমাদের মধ্যে বদলায়নি কিছুই।

থিয়েটারের কাজ ছেড়ে সিনেমার কাজ করছি—শুধু এমিলিয়ার গৃহ-নির্মাণের সাধ পূরণ করবার জন্য। যতদিন মনে ধারণা ছিল—এমিলিয়া আমায় ভালবাসে, ততদিন চিত্র-সম্পাদনার কাজ শ্রমসাধ্য মনে হতো না, উৎসাহ ছিল মনে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার ঘটনার পর থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছি, চঞ্চল হয়েছে মন, বিতৃষ্ণা এসেছে কাজে। সত্যিই, সিনেমায় কাজ নিয়েছি, এমন কি—তার চেয়েও খারাপ কাজ করতে পারতাম—এমিলিয়ার প্রতি আমার প্রেমেরই খাতিরে। এখন সে-প্রেম নষ্ট হতে চলেছে। এখন এ কাজ করার কোন মানে নাই, যুক্তি নেই। এ শুধু নিছক দাসত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।.. ......

আমার মনের অবস্থা আরো পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে হলে এ প্রসঙ্গে চিত্র-সম্পাদকের কাজ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার।

চিত্রনাট্য হলো—নাটক, দৃশ্য ও চিত্রগ্রহণ, নির্দেশনা ও পরিচালনা—এক সঙ্গে সবই। চিত্র-সম্পাদকের কাজ গুরুত্বপূর্ণ। তার স্থান চিত্র-পরিচালকের ঠিক পরেই। কিন্তু চিত্র-সম্পাদক সে মর্যাদা পায় না সচরাচর। আঙ্গিকের দিক থেকে শিল্পকে বিচার করলে চিত্র-সম্পাদককে শিল্পী বলা যায়। চিত্রের মধ্যে সে দেয় তার সবটুকু, অথচ জানতেই পারে না—সেখানেই তার প্রকৃত প্রকাশ। তাই তার সার্থক সৃষ্টিকর্ম সত্ত্বেও সে হয়ে থাকে একজন প্রস্তাবক মাত্র। যবনিকার অন্তরালে তার স্থান—অথচ চিত্রের সাফল্যের জন্য সে বুকের রক্ত ক্ষয় করে। এ কাজে সে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে, মোটা মাইনে পেতে পারে, কিন্তু কখনও বলতে পারে না: আমিই ছবিটি তৈরী করেছি···নিজেকে প্রকাশ করেছি······এ ছবি আমারই গড়া। অর্থের বিনিময়ে সে কাজ করে। চিত্র-সম্পাদকের জীবন হলো—শ্রমের বিনিময়ে যা' পায় তা' দিয়ে সম্ভব হলে আনন্দ উপভোগ করা, অবিশ্রান্ত অবিরাম—কখনও হাস্যরসাত্মক, কখনও করুণ রসাত্মক, কখনও বা দুঃসাহসিক অভিযানপূর্ণ কাহিনীর রূপায়ণ করে যাওয়া। নার্স একটি শিশুকে ছেড়ে আর একটি শিশু-পালনের ভার নেয়, আর তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করেন শিশুর জননী—একমাত্র জননীই শিশুকে নিজের বলে দাবী করতে পারেন। এও ঠিক তেমনি। এ ছাড়াও, চিত্র-সম্পাদকের কাজে আরো সব অসুবিধা রয়েছে। চিত্র-সম্পাদক ও সহযোগী চিত্র-সম্পাদকদের গুণ ও রকম ভেদে সে-অসুবিধাগুলোও কম বিরক্তিকর নয়। চিত্র-সম্পাদকের স্বাধীন সত্তা নেই, স্বাস্থ্য ও রুচির অনুকূল পরিবেশ নেই। নিজের অভিজ্ঞতা, রুচি ও সংস্কৃতি ভুলে অর্থোপার্জনের জন্য

তাকে কাজ করতে হয় দিনের পর দিন। অবশ্যি, কখনও যে অনুকূল পরিবেশ থাকে না—এ কথা বলা যায় না। তবে, ভালো ছবি যেমন বিরল, তেমনি সত্যিকারের সুস্থ পরিবেশও দেখা যায় কচিৎ।……

এবার ব্যক্তিসত্তা নয়—আরেকজন চিত্র-নির্মাতার সঙ্গে দ্বিতীয় চিত্রনাট্য সম্পাদনার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলাম।…

সংকল্প ও আদর্শচ্যুত হ'লাম আমি।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মনে হতো—দিনটি মরুভূমির মতো শুষ্ক, চিন্তা বা বিশ্রামের মরূদ্যান নেই কোথাও—রয়েছে শুধু অনিচ্ছাকৃত চিত্র অনুপ্রেরণার নির্মম সূর্যের প্রচণ্ড তেজ। পরিচালকের ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই তিনি প্রশ্ন করতেন: কাল রাত্রিতে এ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছিলেন কি ?……কিছু সমাধান হলো ?

তখন একঘেয়ে লাগতো, বিদ্রোহী হয়ে উঠতো মন, পরিচালক ও চিত্র-সম্পাদকের সুদীর্ঘ আলোচনা ও সহযোগীদের মতামত শুনতে ভালো লাগতো না। এমন কি, নিজের উদ্ভাবনী-শক্তি কিংবা বিচার-বুদ্ধি সম্বন্ধে পরিচালকের স্তুতিবাদে মন ভরতো না, প্রশংসা বিস্বাদ লাগতো। মনে হতো—নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি আমি। নীতিগত-ভাবে পছন্দ করি না এ কাজ। তবু, তা'তেই নষ্ট করছি আমার সর্বোত্তম বস্তুটি, অপব্যয় করছি আমার প্রতিভার। কিন্তু আশ্চর্য! এত বিদ্বেষ সত্ত্বেও কর্তব্যে অবহেলা করতে পারতাম না। চিত্র-নাট্যকলা হচ্ছে একটি আট ঘোড়ার গাড়ি। তার মধ্যে পরিশ্রমী ও বলবান ঘোড়াগুলিই গাড়ি টানে, বাকি ঘোড়াগুলিকে টানে তা'দের সাথীরাই—যারা একসঙ্গে টানে ঘোড়া ও গাড়ি দু'ই-ই। মনের অধীরতা ও বিরক্তি সত্ত্বেও আমি ছিলাম গাড়ি-টানা ঘোড়া। পরিচালক ও সহযোগীরা অসুবিধে দেখলেই আমার অপেক্ষায় থাকতেন,

সমস্যা-সমাধানের জন্য আমারই কাছে ছুটে আসতেন। নিজের বিচার-ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তাকে অভিশাপ মনে করতাম, তবু বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ সমস্যা সমাধান করে দিতাম। নিজের বিদ্যে জাহির করবার জন্য নয়—সততা ও সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তা' করতাম। পয়সা নিচ্ছি—কাজ করতে হবে। কিন্তু রোজই ক্ষুণ্ণ মনে ভাবতাম—সামান্য ক'টি টাকার জন্য অমূল্য একটি বস্তুর অপব্যবহার করছি, অন্য ক্ষেত্রে সদ্ব্যবহার করতে পারতাম তার।.........

চুক্তিপত্র সই করার ছ'মাস পরে এ অসুবিধাগুলোর কথা জানতে পারলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি—এ সব অসুবিধা আগে চোখে পড়েনি কেন, কেন সেগুলো আবিষ্কার করতে এত দীর্ঘ দিন লাগলো? মনে হলো—যে কাজে একদিন এমন আগ্রহ ছিল, তার উপর আমার বিদ্বেষ ও অসাফল্য এমিলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। অনুভব করলাম—এমিলিয়া ভালবাসে না আমায়। অন্ততঃ, আমার তা'ই ধারণা। কাজে বিরক্তি আসে তাই। যতদিন এমিলিয়ার প্রেম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম, ততদিন সাহস ও বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করেছি। এখন আমি আর নিঃসন্দেহ নই। বিশ্বাস ও মনের বল নেই আর। মনে হয়—এ শুধু দাসত্ব, প্রতিভার অপচয়, সময়ের অপব্যবহার!

পঞ্চম অধ্যায়

দিন চলতে লাগলো।

আমি যেন আসন্ন ব্যাধির অক্ষমতার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি, অথচ ডাক্তারের পরামর্শ নেবার সাহস নেই। ইচ্ছা হলো—যতদিন পারি নিশ্চিন্ত থাকবার চেষ্টা করবো। মনের আকাশে সন্দেহের মেঘ ভিড় করছে। শঙ্কিত হ'লাম তাই। এমিলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলা দুঃসহ; তবু বাস করতে লাগলাম তার সঙ্গে। বৃথাই মনকে প্রবোধ দিতে চাইলামঃ দিনের বেলায় অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক ও অসম্বন্ধ আলাপ, রাত্রিতে কখনও কখনও প্রেমলীলা—যাকে বলা যায় একতর্ফা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা এমিলিয়ার উপর অত্যাচার,—এই তো স্বাভাবিক আমাদের জীবনে।

পূর্ণতর উদ্যমে কাজ করে যেতে লাগলাম। কিন্তু অনিচ্ছা ও বিদ্বেষ ঘণীভূত হতে লাগলো দিনের পর দিন। তখন সাহস করে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করতে পারলে কাজ ও ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ দুই-ই ছেড়ে দিতাম। কেননা, দু'জনের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল না কারো। কথাটি অবশ্য বুঝেছিলাম অনেক দিন পরে। ভেবেছিলাম, কোন চেষ্টা না করলেও স্বতঃই সমস্যার সমাধান হবে যথাসময়ে। হয়েছিলও তাই। তবে, আমি যেমন চেয়েছিলাম ঠিক তেমনি ভাবে নয়।...

ক্ষীণ অস্পষ্ট আশায় দিন কেটে যাচ্ছে। এমিলিয়া গ্রাহ্য করে না আমায়। মন দিয়ে কাজ করতে পারি না। অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি মাঝে মাঝে। দুশ্চিন্তা জেগে ওঠে মনে।

ইতোমধ্যে বাত্তিসতার চিত্র-নাট্য সম্পাদনার কাজ শেষ হলো। আমায় আর একটি কাজের কথা বললেন বাত্তিসতা। আগের কাজটির চেয়ে এ কাজটি কঠিন। চিত্র-নির্মাতারা সচরাচর যেমন হয়ে থাকেন, বাত্তিসতাও তেমনি চঞ্চল, তাঁর কথাবার্তা রহস্যপূর্ণ। তিনি বললেন, এবার প্রথম চিত্র-নাট্যটির চেয়ে বেশি টাকা পাবেন আপনি।

চিত্র-সম্পাদনায় আর আগ্রহ ছিল না আমার। তবু, সহজ প্রবৃত্তি-বশেই সর্বাগ্রে মনে পড়লো সেই ফ্ল্যাটটির কথা। তাই উৎফুল্ল হ'লাম বাত্তিসতার প্রস্তাবে। যাহোক, চিত্রশিল্পের কাজই এমনি। কাজ না এলে মন সংশয়াকুল হয়—আমি হয়তো বাতিল হয়ে গেলাম! কাজ এলে উৎসাহের অন্ত থাকে না।......

দু'টি কারণে বাত্তিসতার নতুন প্রস্তাবটির কথা এমিলিয়াকে জানালাম না। প্রথমতঃ, প্রস্তাবটি গ্রহণ করবো কিনা জানি না। দ্বিতীয়তঃ, জেনেছি—আমার কাজে কোন কৌতূহল নেই এমিলিয়ার। তাই সে-সম্বন্ধে তাকে না জানানোই ঠিক করেছিলাম। যেন আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি—সে সত্যিই নির্বিকার। না। এ বিষয়টির উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করবো না। তবু জানতাম, এমিলিয়ার ভালবাসা বা উপেক্ষার উপরই কাজটি নেওয়া না-নেওয়া নির্ভর করছে। এমিলিয়া আমায় ভালবাসে না আর। তাই ঠিক করতে পারছিলাম না কাজটি নেবো কি নেবো না। সে যদি আমায় আগের মতো ভালবাসতো তবে তাকে জানাতাম। আর—তাকে জানানো মানে কাজটি নেওয়া।.........

বাত্তিসতার জন্য যে চিত্রনাট্যটি লিখেছিলাম—তারই চিত্র-পরিচালকের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে বেরোলাম সেদিন সকালে। আজই শেষ—আর দু'টি পৃষ্ঠা মাত্র থাকি। তৃপ্তি বোধ করলাম তাই।

কাজটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। যাক্, তবু স্বস্তিতে বাস করা যাবে কিছুদিন। চিত্র-নাট্যের বেলায় এ তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। দু'মাস ধরে একটানা কাজ করার পর চিত্রের চরিত্র ও কাহিনীর উপর বিরক্তি এসে যায়। শিগগিরই হয়তো আর একটি বিরক্তিকর কাহিনী ও কয়েকটী চরিত্রের কবলে পড়বো আবার। আপাততঃ তো একটির হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছি!.........

আসন্ন মুক্তির আশায় ও আনন্দে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করলাম। পাণ্ডুলিপির কয়েক যায়গায় অদল-বদল করতে হলো। এ-বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম ক'দিন ধরে।

আজ আলোচনা সহজেই ঠিক পথে চালিয়ে নিলাম, প্রচণ্ড উৎসাহে সমস্যার সমাধান করে ফেললাম। মাত্র দু' ঘণ্টার মধ্যে বুঝতে পারলাম—চিত্রনাট্য-সম্পাদনা শেষ হয়েছে।

পর্বতারোহী যেমন হঠাৎ তার হারানো লক্ষ্য-পথ দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি একটি সংলাপ রচনা করে সবিস্ময়ে বলে উঠলাম: কেন—এখানেই তো শেষ করা যেতে পারে!.........

ঘরের ভিতর পায়চারি করছিলেন পরিচালক। লিখে যাচ্ছিলাম আমি, পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। আমার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে লেখাটি পড়ে দেখলেন। সোৎসাহে বললেন, ঠিক—ঠিক বলেছেন...সত্যিই তো, এখানে শেষ করা যায়।......

সুতরাং পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় লিখলাম—'স-মা-প্ত'। তারপর বন্ধ করলাম পাণ্ডুলিপি।

মুহূর্তেক দাঁড়িয়ে রইলাম দু'জনে। কারো মুখে ভাষা নেই। দু'জনের দৃষ্টি ডেস্ক্-এর উপর নিবদ্ধ—যেন দু'জন অবসন্ন পর্বতারোহী

অতি কষ্টে একটি অপরিসর হ্রদে বা চূড়ায় এসে মুগ্ধ বিস্ময়ে পরম তৃপ্তিভরে চেয়ে আছে।

অবশেষে পরিচালক বললেন, কাজ শেষ হলো তা'হলে। একটু পরে মুচকি হেসে বললেন, কাঁচা টাকার লোভে তাড়াতাড়ি আপনি কাজটি শেষ করতে পারলেন—না?

পরিচালকের নাম মিঃ পাসেত্তি। সুদর্শন তরুণ। তাঁর চেহারা সূক্ষ্ম জ্যামিতিক বা হিসাব-রক্ষকের মতো—শিল্পী-জনোচিত নয়। বয়স প্রায় আমারই সমান। কিন্তু তিনি পরিচালক, আর আমি চিত্রনাট্য সম্পাদক। দু'জনের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের মতো। কেন না, আমার অন্যান্য সহযোগীদের তুলনায় পরিচালকের ক্ষমতাই বেশি।

পাসেত্তিকে খারাপ লাগতো না আমার। আমার সঙ্গে তাঁর জীবন ও চরিত্রের কোন মিল নেই। কল্পনা-শক্তি ও সাহস না থাকলেও ভদ্রলোককে মোটামুটি শিষ্টাচারী বলা চলে। তাঁর রসিকতায় গম্ভীর-ভাবেই বললাম, হ্যাঁ, তাই।

একটি সিগারেট ধরিয়ে তিনি বললেন, তবে—মনে করবেন না, কাজটা শেষ হয়েছে······প্রধান অংশটা শেষ হয়েছে, সংলাপ সংশোধন করতে হবে আগাগোড়া······এখনও ঠিক করে বলা যায় না—কতখানি সুনাম হয় আপনার।

বললাম, কিছু ভাববেন না। দরকার হ'লেই খবর পাঠাবেন, আমি নিশ্চয় আসবো।

মাথা নাড়তে নাড়তে পাসেত্তি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ···আমিও আমার কর্তব্য জানি······আপনার প্রাপ্য সবটা না দিয়ে কিছু হাতে রেখে দিতে হবে······বুঝলেন তো?

তাঁর এই সকৌতুক উক্তির মধ্যে লক্ষ্য করলাম কর্তৃত্বের স্বর। তাঁর মতো তরুণের মুখে এ ধরণের উক্তি বিস্ময়কর। তিনি তাঁর সহযোগীদের কখনও প্রশংসা করেন, পরক্ষণেই দোষারোপ করেন তা'দের উপর, আবার কখনও তোষামোদ করেন, আদেশের সুরে অনুরোধ জানান। এ হিসাবে তাঁকে একজন সুদক্ষ চিত্র-পরিচালক বলা যায়। কেননা, কাজ করিয়ে নেবার ক্ষমতার উপরই পরিচালকের কৃতিত্ব নির্ভর করে অনেকখানি।

বললাম, না……আমার সব টাকাটা দিতে বলবেন……আপনাকে কথা দিচ্ছি—যখনই দরকার হবে—কাজ করে দিয়ে যাবো।

রসিকতা করে তিনি বললেন, দেখুন মশায়,—এত টাকা দিয়ে কী করেন আপনি? টাকায় কুলোয় না আপনাকে……অথচ আপনার কোন দেনা নেই, উপপত্নী নেই, এমনকি—ছেলেপিলেও নেই……

তাঁর কথায় একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, ফ্ল্যাটের কিস্তি দিতে হয়।

ঃ অনেক টাকা বাকী রয়েছে বুঝি?

ঃ প্রায় সব টাকাটাই বাকি।

ঃ তবু, আমি বাজী রেখে বলতে পারি—পাওনা টাকা আদায় করতে না পারলে আপনার স্ত্রী আপনাকে ধমকান……আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তাঁর কণ্ঠস্বর……তিনি আপনাকে বলছেন ঃ দেখ রিকার্ডো, ওদের কাছ থেকে সব টাকাটা নিয়ে এসো কিন্তু……না?

মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলো এবার। বললাম, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী…… কিন্তু আপনি তো জানেন—মেয়েদের স্বভাব……ঘর তাদের কাছে অতি মূল্যবান।

ঃ আমায় ওকথা বলছেন আপনি?

তিনি তাঁর স্ত্রীর গুণ ব্যাখ্যান করতে লাগলেন ঃ

পাসেত্তির যোগ্য পত্নী তিনি। পাসেত্তি মনে করেন—তিনি একটি চঞ্চল জীব—অস্বাভাবিক অনেক কিছুই……তবে, একটি স্ত্রীলোক………

মন ছুটে গিয়েছিল দূরে। তবু এমন ভাব দেখালাম—যেন মনোযোগ দিয়ে শুনছি। হঠাৎ তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন :

তা' ··বেশ ভালো···কিন্তু আমি জানি, আপনারা—চিত্র-সম্পাদকেরা কী···সবাই ঠিক একই ধরণের···টাকাটা হাতে এলেই—ব্যস্…… আপনাদের টিকি পর্যন্ত দেখা যায় না—নাগাল পাওয়া তো পরম সৌভাগ্য……না না……বাত্তিসতাকে বলতে হবে, আপনার একটা কিস্তির টাকা যেন হাতে রেখে দেন।

: দেখুন—আমি যা' বলেছি, তা'ই করবেন দয়া করে।

: আচ্ছা—বেশ, দেখবো···তবে, বিশেষ ভরসা করে থাকবেন না। আবার ঘড়ির দিকে চাইলাম। কর্তৃত্ব দেখাবার সুযোগ দিয়েছি তাঁকে, তিনি সে-সুযোগ গ্রহণ করেছেন। যা'হোক, যেতে হবে এবার। বললাম, খুশি হলাম—কাজটি শেষ হয়েছে। যাবার সময় হয়েছে আমার।

বিনা চিন্তায় স্ফূর্তির সঙ্গে তিনি বললেন, সে কী—আসুন, আমাদের আগামী চিত্রের সাফল্যের জন্য পানাহার করা যাক……চিত্র-নাট্য শেষ করার পর আপনাকে তো আর এমনি করে যেতে দিতে পারি না··· আমার বাড়ি যেতে কোন আপত্তি নেই তো আপনার?

বললাম, না, আপত্তি কিসের?

: বেশ আসুন—আসুন তবে……আমার স্ত্রী এ আনন্দে যোগ দিতে পারলে খুশি হবেন।………

পাসেত্তির সঙ্গে চললাম একটি সরু পথ বেয়ে।

আগে আগে ঘরে ঢুকে পাসেত্তি ডাকলেন, লুইস্!……মলটেনি ও আমি আমাদের চিত্র-নাট্য শেষ করেছি……এখন আমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য পানাহার করতে চাই আমরা।

চেয়ারে বসেছিলেন মিসেস পাসেত্তি। পাসেত্তির কথা শুনে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন তিনি।

ভদ্রমহিলা খর্বকায়া, স্থূলাঙ্গী, বিবর্ণ মুখখানির উপর নেমে এসেছে কালো চুল। তাঁর চোখ দু'টি ডাগর, রঙ ফ্যাকাশে। স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর চোখের তারা জ্বলজ্বল করে, সারাক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু স্বামী চলে গেলেই চোখ তুলে তাকান না কোন দিকে ····চার বছর ধ'রে স্বামীর ঘর করছেন……এরই মধ্যে চারটি সন্তানের জননী হয়েছেন।

পাসেত্তি বললেন, আজ সবাই মিলে তৃপ্তি ভরে মদ খাবো…… কি বল ?

মিসেস পাসেত্তি সবিনয়ে উত্তর দিলেন, কিন্তু তুমি তো জান— আমি মদ খাই না।

: তবে,—আমরাই খাবো।

অগ্নি-কুণ্ডের বিপরীত দিকে চেয়ারে বসেছিলাম। মিসেস পাসেত্তির মুখোমুখি চুপ করে বসে বসে ঘরটি দেখছিলাম। আমার সঙ্গে আলাপ করবার কোন প্রয়োজনই বোধ করলেন না মিসেস পাসেত্তি। ঘাড় নিচু ক'রে কোলের উপর হাত রেখে স্থির ভাবে বসে রইলেন। দু'বোতল মদ এনে টেবিলের উপর রেখে বরফ আনতে বাইরে গেলেন পাসেত্তি।

নীরবে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললাম, জানেন— মিসেস পাসেত্তি, আমাদের চিত্র-নাট্যটি শেষ হয়েছে ?

চোখ না তুলেই মিসেস পাসেত্তি বললেন, হ্যাঁ, জিনোর কাছে শুনেছি—

: ছবিটি যে খুব ভালো হবে—এ সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ নেই আমার।

: আমারও নেই···নইলে কি আর জিনো ও-ছবির ভার নিত ?

: আচ্ছা, গল্পটি জানেন আপনি ?

: হ্যাঁ, জিনো বলেছে।

: ভাল লেগেছে আপনার ?

: জিনোর ভালো লেগেছে—আমার কি আর ভালো না লেগে পারে ?

: সব সময় আপনারা দু'জনেই বুঝি এক-মত হন ?

: জিনো ও আমি ?······হ্যাঁ, নিশ্চয়······নিশ্চয়।

: তবু, কার মত বেশি প্রবল হয় ?

: কেন ? জিনোর—

লক্ষ্য করলাম, জিনো ছাড়া আর কোন কথা নেই তাঁর মুখে। ধীর ভাবে আমার কথার উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি।

বরফ নিয়ে ফিরে এসেই পাসেত্তি বললেন, রিকার্ডো, আপনার স্ত্রী আপনাকে টেলিফোন করছেন।······

আমার সুখের দিন অতর্কিতে ফিরে এলো বুঝি !

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালাম।

পাসেত্তি বললেন, ও-ঘরেই টেলিফোনটি রয়েছে······তবে, এখান থেকেও কথা বলতে পারেন······সুইচ্ লাগিয়ে দিচ্ছি।

অগ্নি-কুণ্ডের পাশে একটি বাক্সের উপর ছিল টেলিফোনটি। রিসিভার তুলেই শুনলাম, এমিলিয়ার কণ্ঠস্বর: আমি মার কাছে যাচ্ছি······ তুমি বাইরে খেয়ে এসো, বুঝলে······কিছু ভেবো না যেন।

: কিন্তু—আগে বলনি কেন ?

: তোমার কাজে বাধা হবে বলে।

: বেশ, আমি রেস্তোরাঁয় খাবো।

: আচ্ছা।

রিসিভারটি রেখে পাসেত্তির দিকে চাইলাম। পাসেত্তি প্রশ্ন করলেন, আপনি কি আজ বাড়ি ফিরছেন না ? বাড়িতে খাবেন না ?

: না, রেস্তোরাঁয় খাবো।

: তা' কেন—আমাদের সঙ্গে খাবেন……সাধারণ খাওয়া……তবু ……তা'তে খুশি হবো আমরা দু'জনেই……

ভেবেছিলাম, চিত্র-নাট্যটি শেষ হবার সংবাদটা দেবো এমিলিয়াকে। তাই একা রেস্তোরাঁয় খাওয়ার কথা ভাবতেই হতাশ হয়ে পড়লাম। হয়তো শেষ পর্যন্ত বলতাম না তাকে। এ-বিষয়ে তো তার আগ্রহ নেই আর। তবু, দু'জনের পুরনো সম্পর্কের কথা যে ভুলতে পারিনি !

খুশি হলাম পাসেত্তির নিমন্ত্রণে। শুধু সানন্দে রাজী হলাম না, কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম।

বোতল দু'টির মুখ খুলে জিন ও সুরা মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে লাগলেন পাসেত্তি। মিসেস পাসেত্তি অপলক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন।……মিশ্রিত সুরা গ্লাসে ঢালতে লাগলেন পাসেত্তি। মিসেস পাসেত্তি অধীর ভাবে বললেন, শুধু এক ফোঁটা……এত দিয়ো না……আর……তুমি—তুমিও বেশি খেয়ো না, জিনো……অনিষ্ট হতে পারে।

হাসলেন পাসেত্তি। বললেন : কী যে বল ! রোজই তো আর চিত্র-নাট্য শেষ হয় না !

•

তিনি দু'টি গ্লাস ভর্তি করে নিলেন,—তৃতীয় গ্লাসটিতে নিলেন খুব অল্প—তাঁর স্ত্রী যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি। গ্লাস তুলে নিলাম তিনজনেই।

ঠোঁট দু'টি একটু ভিজিয়ে গেলাসটি টেবিলের উপর রেখে পাসেত্তি বললেন, এমনি আরো একশোটি চিত্র-নাট্য শেষ করতে পারি যেন······এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেললাম পানীয়টুকু। একটু একটু করে গলাধঃকরণ করে মিসেস পাসেত্তি বললেন, এবার রান্নাঘরে গিয়ে দেখি—ঝি-টা কী করছে ·····কিছু মনে করবেন না।

বেরিয়ে গেলেন মিসেস·পাসেত্তি।

পাসেত্তি চেয়ারে বসলেন। গল্প-গুজব আরম্ভ হ'লো। কথা বলছিলেন পাসেত্তিই। তিনি যা বললেন, প্রায় সবটাই চিত্র-নাট্য সম্বন্ধে। নীরবে শুনতে লাগলাম, ঘাড় নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠে সায় দিতে লাগলাম। তিন চার গেলাস মদ খেয়েছি, তবু নেশা হয়নি, মনের দুঃখ বেড়েছে শুধু। মনে পড়লো—একটু আগেই শুনেছি এমিলিয়ার উদাস ও যুক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর। মিসেস পাসেত্তির সঙ্গে কত তফাৎ তার! আর চিন্তা করতে পারলাম না।·····

কিছুক্ষণ পরেই মিসেস পাসেত্তি এসে খেতে ডাকলেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার ঘরটি। পরিচারিকা খাবার রেখে গেল সন্তর্পণে। নীরবে আহার করতে লাগলাম। পাসেত্তিকে প্রশ্ন করলাম তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে। স্বাভাবিক নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনা মনঃপূত হলো না আমার। সেই একঘেয়ে কথা শুনতে ভাল লাগছিল না। চঞ্চল হয়ে উঠেছিল আমার দৃষ্টি। হঠাৎ মিসেস পাসেত্তির উপর চোখ পড়লোঃ আমাদের আলাপ শুনছেন তিনি। গালে হাত দিয়ে চেয়ে আছেন স্বামীর মুখের

দিকে। তাঁর দৃষ্টি প্রণয়াকুল, অভিভূত, শ্রদ্ধা-জড়িত, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ, ভীরু, বিষণ্ণ ও বিমুগ্ধ।

অবাক হয়ে গেলাম তাঁর রহস্যময় আবেগ দেখে। নারীর চিত্ত জয় করার মতো কোন গুণই নেই পাসেত্তির। তাই মিসেস পাসেত্তির এই অসামান্য আকর্ষণ দেখে নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। তারপর মনে মনে বললাম—পুরুষমাত্রেই খুঁজে নেয় এমন নারী, যে তাকে ভালবাসে ও তার গুণাবধারণ করে। নিজের মন দিয়ে তো অপরের মন যাচাই করা যায় না! পতিভক্তির জন্য মিসেস পাসেত্তির উপর সমবেদনা জাগলো। তাঁর আচরণ অদ্ভুত হলেও ভালো লাগলো তাঁকে। ক্লান্ত হয়ে পড়লাম অবশেষে। হয়তো, তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম: ঐ নারীর দু'টি চোখে ফুটে উঠেছে—স্বামীর প্রতি অকপট প্রেম…তাঁর স্বামী তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, কারণ তার স্ত্রী তাঁকে ভালবাসে… কিন্তু এমিলিয়ার চোখে সে-আসক্তি নেই……এমিলিয়া আমায় ভালবাসে না।……

হঠাৎ থর থর কেঁপে উঠলো সর্ব শরীর। পাসেত্তি তখনও বলে যাচ্ছিলেন অনর্গল। শুনতেই পাচ্ছিলাম না তাঁর কথা। মনে মনে নিজের এই তীব্র ও দুর্বোধ বেদনার অনুভূতি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করছিলাম।……না না, এমনি করে বসে থাকতে পারি না…… এমিলিয়ার কাছে কিফিয়ৎ চাইবো—প্রয়োজন হলে চলে যাবো তার কাছ থেকে, কাজও ছেড়ে দেবো।

বার বার ভাবলাম, প্রতিজ্ঞা করলাম গভীর হতাশায়। তবু, পুরোপুরি বিশ্বাস হলো না—প্রেম হারিয়েছি এমিলিয়ার, তার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে, সিনেমার কাজ ছাড়বো। নির্মম নিশ্চিত এই অভিনব অনুভূতি! কেন, কেন? এই মর্মন্তুদ সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করার আগে চাই প্রমাণ—আরো স্পষ্ট প্রমাণ। কেন সে ভাল-বাসে না আমায়? তার নিজের মুখ থেকে শুনতে হবে, বিচার করে দেখতে হবে। যে ক্ষতকে একদিন আমলই দিইনি, আজ তারই ভিতর দিয়ে চালাতে হবে অনুসন্ধানের শানিত ছুরিকা। ভয় পেয়ে গেলাম মনে মনে। তবু বুঝলাম, চরম অনুসন্ধানের পরেই এমিলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার সাহস হবে।······

খাওয়া শেষ হলো যথাসময়ে। আরো কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করলাম বৈঠকখানায় বসে। তারপর ব্যস্ততার ভাব না দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। দাই এসে ঘরে ঢুকলো পাসেত্তির বড় মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। বাইরে নেবার আগে মেয়েটিকে একবার তার মা-বাবাকে দেখিয়ে নিতে এসেছে সে। মিসেস পাসেত্তি মেয়েটিকে বুকে নিলেন, চুমো খেলেন তার কচি মুখে। ভাবলাম, কখনও ওদের মতো সুখী হবো না আমি, এমিলিয়া ও আমার সন্তান হবে না এ জন্মে···

অপত্য-স্নেহের এই অপূর্ব দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলাম না। অধীর হয়ে উঠলাম। বললাম, এবার যাবো······

আমায় গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন পাসেত্তি। আমার অপ্রত্যাশিত বিদায়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন মিসেস পাসেত্তি। হয়তো ভাবলেন—তাঁর মাতৃ-মমতার মধুর দৃশ্য দেখে কেন এমন অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেলা চারটে পর্যন্ত কোন কাজ নেই। এখনও দেড় ঘণ্টা সময় হাতে আছে। রাস্তায় এসে সহজাত প্রবৃত্তিবশেই বাড়ির দিকে চললাম। জানতাম, এমিলিয়া ঘরে নেই, তার মার কাছে গেছে। বিপন্ন বিহ্বল হয়েছিলাম তবু। আশা করলাম—এমিলিয়া হয়তো যায়নি—ঘরেই আছে। ঠিক করলাম, তার সঙ্গে স্পষ্ট আলাপ করে নেবো। তার উত্তরের উপরই নির্ভর করছে সব। এ সংশয় ও মিথ্যাচরণের পর যে দুর্বিষহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি তার চেয়ে যে-কোন বিপদই কম কষ্টকর হবে। হয়তো, এমিলিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, বাত্তিসতার চিত্র-নাট্য-সম্পাদনার ভার নেবো না। তা'ও বরং ভালো। অনিশ্চিত আমার অবস্থা,—একদিকে মিথ্যা আর এক দিকে আত্মগ্লানি। এখন সত্যই আমার কাম্য।

বাড়ির কাছে রাস্তায় এসেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এমিলিয়া ঘরে নেই নিশ্চয়। নতুন ফ্ল্যাটটিতে ঢুকলেই মন আরো চঞ্চল বিমর্ষ হবে। তার চেয়ে বাইরেই থাকবো—কোন কাফেতে বসে দেড় ঘণ্টা কাটিয়ে আসবো।

হঠাৎ মনে পড়লো—বাত্তিসতাকে কথা দিয়েছি: তিনি টেলিফোন করে আমায় জানিয়ে দেবেন—কখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। কাজটি বিশেষ জরুরী। বাত্তিসতাকে বলেছি—আমি এখন ঘরে থাকবো। কোন কাফে থেকে তাঁকে টেলিফোন করা যায়, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই। যা'হোক, এ অছিলায় বাড়ি যেতে পারি।

হল-এ এসে লিফ্ট-এ উঠলাম। দরজা বন্ধ করে বোতাম টিপ্তেই লিফ্ট চললো।

বাত্তিসতার সঙ্গে যোগাযোগের আর প্রয়োজন কি? এমিলিয়ার সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার উপরই তো নির্ভর করছে সব।...... জানি, এমিলিয়া যদি স্পষ্ট ভাষায় বলে—সে আমায় ভালবাসে না, তা'হলে জীবনে আর কখনও চিত্র-সম্পাদনা করবে না। তবে হ্যাঁ, এমিলিয়া ঘরে নেই এখন, বাত্তিসতার টেলিফোনের জবাবে তাঁকে জানানো যাবে না আমার মত। তা'ই ভালো। আমার জীবনে তো অসঙ্গতি রয়েছে অনেক। তবু, এতদূর এগিয়ে এসে পিছিয়ে পড়া আরো অসঙ্গত হবে। ঘৃণায় ও ক্রোধে ফেটে পড়ছিল সারা অন্তর। লিফ্ট-এর বোতামটি নিচের দিকে টিপলাম। এমিলিয়ার সঙ্গে কথা বলেই বাত্তিসতাকে জানিয়ে দেবো—কাজটি নেবো কিনা। নিচে নেমে এলো লিফ্ট। দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিলাম।......এমন সময় আর একটি প্রশ্ন মনে জাগলো: আচ্ছা, এমিলিয়া যদি আমায় নতুন করে ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দেয়, আর বাত্তিসতা টেলিফোন করে আমায় না পান? তা'হলে কাজটি পাওয়া যাবে না। আমার অভিজ্ঞতা এই যে চিত্র-নির্মাতারা খামখেয়ালীই হয়ে থাকেন। বাত্তিসতা হয়তো মত পরিবর্তন করে আর কাউকে নেবেন। মাথা ঘুরতে লাগলো, অসহায় বোধ করলাম। স্বার্থ ও প্রেমের মাঝখানে হাবুডুবু খাচ্ছি, বুঝে উঠতে পারছি না—কোন দিকে যাবো? স্থির ভাবে লিফট্-এ দাঁড়িয়ে রইলাম। বগলে কয়েকটি পুঁটলি নিয়ে লিফ্ট-এ চড়লেন জনৈকা তরুণী। হঠাৎ আমায় দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে বোতাম টিপলেন। লিফ্ট উপরের দিকে উঠতে লাগলো; .....

স্বস্তি বোধ করলাম এবার। সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগলো : ছিঃ ছিঃ এমন করছি কেন? কোন্ স্তরে নেমে এলাম হঠাৎ? ফ্লাটে ঢুকে দেখলাম—একটি সোফার উপর শুয়ে একখানি মাসিক পত্র পড়ছে এমিলিয়া। পাশে দু'টি প্লেট ও ভুক্তাবশিষ্ট পড়ে রয়েছে। বাইরে যায়নি সে, মার সঙ্গে খায়নি, মিথ্যে বলেছে আমায়।

আমার মুখের দিকে চেয়ে সে ব্যস্ত ভাবে প্রশ্ন করল, কী হয়েছে তোমার?

রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, তুমি মার কাছে যাওনি?

সহজ, স্পষ্ট স্বরে এমিলিয়া বলল, না……পরে টেলিফোন করে মা বারণ করেছিলেন।

আমায় জানাও নি কেন?

: অনেকক্ষণ পরে টেলিফোন করেছিলেন তিনি…ভেবেছিলাম, তুমি ততক্ষণে পাসেত্তির ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছ।

না। মিথ্যে বলছে এমিলিয়া। কিন্তু তার তো কোন প্রমাণ নেই। তাই চুপ করে সোফার উপর বসলাম।

একটু পরে মাসিক পত্রের একটি পাতা উল্‌টে চোখ না তুলেই সে প্রশ্ন করল : আর তুমি—তুমি কী করলে এতক্ষণ?

: পাসেত্তি ও তার স্ত্রী আমায় খেয়ে আসতে বললেন…

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো।

নিশ্চয় বাত্তিসতা! তাঁকে বলবো—আমি আর চিত্র-নাট্য লিখবো না…জাহান্নামে যাক সবই…এমিলিয়া একটুও ভালবাসে না আমায়।

এমিলিয়া আলস্যভরে বলল, একবার গিয়ে দেখ না, কে ডাকছে… তোমায় ডাকছে নিশ্চয়।

ও-ঘরে গিয়ে রিসিভারটি তুললাম। কিন্তু এ যে আমার শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর! তিনি জিগ্যেস করলেন, এমিলিয়া আছে রিকার্ডো?

ঃ না, সে তো আপনার কাছে গেছে, বলেছে—আপনার সঙ্গে খাবে…সে বেরিয়েছে…আমি তো জানি—সে আপনার কাছেই রয়েছে।

ঃ কেন…আমি তো টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছি—আজ ঝি আসেনি!

দেখলাম, ওঘরে সোফার উপর শুয়ে রয়েছে এমিলিয়া—দু'টি চোখ আমারই উপর নিবদ্ধ। অসন্তোষ ও অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছে তার দৃষ্টিতে। মিথ্যে বলেছি আমি—সে নয়। তা'ছাড়া, সে জানে—কেন মিথ্যে বললাম। তারপর বিড় বিড় করে দু'একটা কথা বলে হঠাৎ নিজেরই ভুল শুধরে বললাম, না—ও…ওই যে এমিলিয়া আসছে… তাকে ডেকে দিচ্ছি……

ইশারায় ডাকলাম এমিলিয়াকে। সোফার উপর থেকে উঠে ঘাড় নিচু করে এগিয়ে এলো সে। আমার দিকে না তাকিয়েই তুলে ধরল রিসিভারটি। শোবার ঘরে চলে এলাম। এমিলিয়া যেন আমায় দরজাটি বন্ধ করতে ইংগিত করলো। দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমার মনের মধ্যে স্থরু হলো আলোড়ন। চুপ করে সোফার উপর বসে রইলাম।

রিসিভারটি অনেকক্ষণ ধরে রইলো এমিলিয়া। অধৈর্য হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, ইচ্ছে করেই দেরী করছে সে। তবু, মনকে সান্ত্বনা দিলাম—হামেশাই তো সে এমনি করে তার মার সঙ্গে কথা বলে। মাকে খুব ভালবাসে সে। বিধবা তিনি। এমিলিয়া ছাড়া আর কেউ নেই তাঁর। মাকে সে সব কথাই খুলে বলে। কোন কথাই গোপন রাখে না।

অবশেষে দরজাটি খুলে ঘরে এলো এমিলিয়া। কিন্তু তার চেহারা দেখে বুঝলাম, আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে সে।

টেবিলের উপর থেকে প্লেট ও চামচ তুলে নিতে নিতে সে বলল, আচ্ছা বল তো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?......মাকে কেন বলতে গেলে—আমি ঘরে নেই?

চুপ করে রইলাম।

এমিলিয়া বলতে লাগলো, আমায় পরীক্ষা করছিলে? দেখছিলে—আমি যে মার কাছে যেতে পারিনি—এ কথা সত্যি কিনা,—না?

রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলাম, হয়তো তাই।

ঃ দয়া করে আর কখনো এমন করতে যেয়ো না......আমি সত্য কথাই বলি...তোমার কাছে গোপন রাখার মতো কিছু নেই আমার...তা'ই তো সহ্য করতে পারি না আমি......

দৃঢ়-কণ্ঠে কথাগুলো বলে প্লেট ও গেলাসসুদ্ধ ট্রে-টি নিয়ে বেরিয়ে গেল এমিলিয়া।

একা পড়ে রইলাম আমি। মুহূর্তের জন্য বিজয়ের তিক্ত আবেগ অনুভব করলাম......

ঃ তা'হলে, সত্যিই আমায় ভালবাসে না এমিলিয়া। আগে তো সে কখনও এমন কথা বলত না। শান্ত মধুর বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে বলতো, তুমি—তুমি ভেবেছিলে—মিথ্যে বলেছি আমি?... তারপর খিল খিল করে হেসে উঠতো আমার শিশু-সুলভ প্রমাদে। বলতো, তোমার ঈর্ষা হচ্ছিল নিশ্চয়......আচ্ছা, তুমি কি জান না, তোমায় ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি না আমি?...চুম্বনে শেষ হ'তো এই পর্ব। তা'ছাড়া, তাকে চোখে-চোখে রাখা'র কল্পনাই করতাম না, অবিশ্বাস করতে পারতাম না তার কোন কথা। এখন সে যেন বদলে গেছে, তার

প্রেম অন্য রূপ নিয়েছে—আমিও বদলে গেছি। সবই ধীরে ধীরে খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবে।

গভীর হতাশার অন্ধকারেও মানুষের মনে জেগে ওঠে ক্ষীণ আশার আলোক। সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে—এমিলিয়া আমায় ভালবাসে না। তবু সংশয়, সংশয় নয়—আশা! তবু, এমিলিয়ার মুখেই শুনবো সেই নির্মম সত্য: সে আমায় ভালবাসে না। তার কাছ থেকেই পাবো প্রমাণ—যা' আজো পাইনি। শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম। দরজা খুলে আবার ঘরে এলো এমিলিয়া। আমার পেছনে সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়ে সাময়িক পত্রটি হাতে তুলে নিল। তার দিকে মুখ না ফিরিয়েই বললাম, আর একটি চিত্রনাট্য সম্বন্ধে এক্ষুনি বাত্তিসতার টেলিফোন আসবে।

শান্ত কণ্ঠে এমিলিয়া প্রশ্ন করল, তুমি তা'হলে খুব খুশি হয়েছ, না?

বললাম, খুব ভালো হবে সেই ফিল্মটি······চিত্র-নাট্য লিখে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। লীজ-এর দুটো কিস্তি এক সঙ্গে দিতে পারবো।

কোন জবাব দিল না এমিলিয়া···বললাম, এ কাজটি করতে পারলে আরো অনেক কাজ পাওয়া যাবে······ছবিটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে······

অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন করল এমিলিয়া, কী ছবি?

বললাম, জানি না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললাম, তবে—কাজটি করবো না ঠিক করলাম।

: কেন?

ধীর, উদাস তার কণ্ঠস্বর।

এমিলিয়ার সামনে এসে সোফার উপর বসলাম। সে আমার দিকে চাইলো। বললাম, কারণ তুমি জান—এ কাজ আমার রুচি-সম্মত নয়, তবু তোমায় ভালবাসি বলে……ফ্ল্যাট-এর কিস্তি দেবার জন্য…… কেন না, ফ্ল্যাটটি তোমার কাছে মূল্যবান—তাই, এতদিন এ কাজ করেছি……কিন্তু এখন জেনেছি—তুমি আমায় ভালবাস না আর…… এ অনর্থক……কোন প্রয়োজন নেই এর……

আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল এমিলিয়া। বলল না কিছুই।

: আমায় আর ভালবাস না তুমি……এ সব কাজ করবো না আমি ……আর, ফ্ল্যাটটিও হয় বিক্রি করে দেবো, নয় তো বন্ধক দেবো… এমন করে আর থাকতে পারবো না কিছুতেই……তোমায় জানাবার সময় হয়েছে……তাই বলছি……এক্ষুনি বাত্তিসতা টেলিফোন করবেন…… তাঁকে জানিয়ে দেবো……করবো না তাঁর কাজ……

শেষ হ'য়ে গেল আমার বক্তব্য। হালকা হলো মন। উত্তরের জন্য উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইলাম এমিলিয়ার মুখের দিকে। তার বিস্ময়ের সীমা নেই আমার এ ঘোষণায়। অবশেষে শুনলাম তার প্রশ্ন : কিসে বুঝলে—তোমায় ভালবাসি না?

আবেগ ভরে বললাম, সব কিছুতেই।

: যেমন—?

: আগে বল—আমার এ অনুমান সত্য কিনা।

: না,—আগে তুমিই বল—কিসে বুঝলে?

: সব—সব কিছুতেই।……আমার সঙ্গে তোমার কথার ভঙ্গিতে, তোমার চোখের চাউনিতে, ব্যবহারে……একমাস আগেও তুমি আলাদা থাকতে চেয়েছিলে……তার আগে তো কখনও চাইতে না।

স্থির দৃষ্টিতে সে চাইলো আমার দিকে।

দেখলাম—জ্বল জ্বল করছে তার দু'টি আঁখি-তারা। তবে—তবে কি সে তার কর্তব্য স্থির করে ফেললো? হয়তো আর মত বদলাবে না এমিলিয়া।

স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে এমিলিয়া জবাব দিল, বিশ্বাস কর—খড়খড়ি খুলে রাখলে ঘুম হয় না আমার……নিরিবিলি ও অন্ধকার না হ'লে ঘুমোতে পারি না আমি……তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি—

ঃ আমি তো খড়খড়ি বন্ধ করে রাখতে রাজী ছিলাম।

কী যেন ভেবে সে বলল, ঘুমে ভীষণ নাক ডাক তুমি……রোজ রাত্তিরেই ঘুম ভেঙে যায়……তাই—একা ঘুমোতে চেয়েছিলাম।

বিচলিত হ'লাম তার কথা শুনে। কৈ, আর কেউ তো একথা বলে কখনও। আরো অনেকের সঙ্গেই তো এক শয্যায় রাত কাটিয়েছি। বিশ্বাস হলো না এমিলিয়ার কথায়। বললাম, আমি জানি, আমায় ভালবাস না তুমি। যে স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসে, সে—তুমি যেমন করছ ঠিক তেমনি করে তার ভালবাসা দেখায় না।

বাধা দিয়ে এমিলিয়া বলল, সত্যিই জানি না,—কী চাও তুমি··· যখনই আমায় কাছে পেতে চাও তখুনিই কাছে আসি……কখনও কি বিমুখ করেছি তোমায়?

লজ্জা পেলাম তার কথা শুনে। এ ধরণের স্পষ্ট কথা সে তো আগে বলতো না। যে এমিলিয়া এতদিন সংযত গম্ভীর ছিল—সে যেন তার শালীনতা-বোধ ও সারল্য হারিয়ে ফেলেছে। স্বাভাবিক অজ্ঞতাই হয়তো ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এখন তার চরিত্রে কপটতা স্থান স্থান পেয়েছে। বললাম, না, বিমুখ করনি, কিন্তু—

ঃ যখনই কাছে ডেকেছ তখনই পেয়েছ আমায়……তা'তেও খুশি

নও ?……তা'ছাড়া—শুধু সম্ভোগেই তৃপ্তি পাওয়ার পাত্র নও তুমি…
তুমি তো ও-কাজে ওস্তাদ !

: তাই নাকি !

: হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তোমায় ভাল না বাসলে তোমার প্রেম-লীলায় আপত্তি করতাম, তোমায় এড়িয়ে চলতাম……মেয়েরা ইচ্ছে করলেই একটা-না-একটা অছিলায় পুরুষকে এড়িয়ে যেতে পারে…না ?

: বুঝলাম…তবু—যে ভালবাসে, সে তোমার মতো করে না।

: কী করি আমি ?

ইচ্ছা হলো, বলি—বারাঙ্গনার মতো তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে স্বস্তি পেতে চাও। কিন্তু একথা বললে সম্মান হানি হবে দু'জনেরই। তা'ছাড়া, কী লাভ তাতে ? সে তো স্বীকার করবে না—আমার কথা সত্য। বলবে, নিষ্ক্রিয় না থেকে সে সাড়া দিত—যতখানি দরকার ততখানি। পালটা জবাব দিতে পারবো না। ফলে সে অসন্তুষ্ট হবে এ অসম্মানকর তুলনায়।

বললাম, যাই বল না কেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই—ব্যস্ !

আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করলো এমিলিয়া। যেন ভাবলো—কী করবে ? তার সুন্দর মুখখানি কুঁচকে গেল, দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, গণ্ড স্ফীত হলো, মুখগহ্বর যেন একদিকে সরে গেল, স্তিমিত চোখের তারা চক্ষু-কোটরের মধ্যে মোমের মতো গলে পড়লো। কোন বিপদে পড়লে কিংবা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে হলেই এমন অবস্থা হয় তার।

দু'টি বাহু-লতায় আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে সে বলল, ছিঃ……ওকথা কেন বলছ, রিকার্ডো…আমি তোমায় ভালবাসি আজও…ভালবাসি…
আগে যেমন বাসতাম ঠিক তেমনি…

এমিলিয়ার উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগলো আমার কানে, কপালে। গালে ও চুলের উপর অনুভব করলাম—তার কোমল হাতের পরিচিত সোহাগ-স্পর্শ। আমার মাথাটি বুকের ভিতর টেনে নিয়ে চেপে ধরলো সে।

মনে হলো—এ ছলনা। মুখের ভাব লুকোবার জন্যই সে আমায় আলিঙ্গন করেছে। কামাতুর হয়ে তার নগ্ন বুকের উপর নিজের মুখ চেপে ধরলাম। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দুলছিল উন্নত বক্ষ।

এখন কিছু বললেই ক্ষেপে উঠবে সে। তাই তার এ হাবভাব অর্থপূর্ণ হ'লেও চুপ করে রইলাম।

সে সতর্কভাবে বলল, আচ্ছা—তোমায় যদি সত্যিই ভাল না বাসি, কী করবে বল তো?······

ভুল করিনি তা'হলে। দুঃখ পাই—ক্ষতি নেই। তবু, আমি জয়ী! এমিলিয়ার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সে জানতে চায়—আমি কী করবো? সে যেন পরিমাপ করতে চায়—জানতে চায়, তার স্পষ্ট উক্তির বিপদ কতখানি। তার নরম উষ্ণ বুকে মুখ রেখেই বললাম, তোমায় বলেছি তো······প্রথমেই—বাত্তিসতার কাজটি নেবো না।

ভাবলাম, তাকে জানিয়ে দিই—তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবো। কিন্তু সাহস করে বলতে পারলাম না ও-কথাটি। তখনও আশা করছিলাম—সে ভালবাসে আমায়।

বিচ্ছেদের আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠলো। আমায় বুকের কাছে—আরো কাছে টেনে নিল এমিলিয়া। বলল, সত্যিই—আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি······এ সব সত্যি নয়—আজগুবি, মিথ্যে ······এখন তুমি কী করবে—জান? বাত্তিসতার ফোন এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার দিন ঠিক করে নাও, তারপর কাজটি আরম্ভ কর।

উত্তেজিত ভাবে বললাম, না, তুমি আমায় ভালবাস না। কেন—কেন তোমার কথা শুনবো ?

ঃ বলেছি তো—তোমায় ভালবাসি……তবু কেন বার বার বলাতে চাও ও-কথাটি…আমি তোমারই সঙ্গে রয়েছি—এও কি তার যথেষ্ট প্রমাণ নয় ?…তবে, হ্যাঁ—যদি ভেবে থাক যে আমি তোমায় ভালবাসি না বলেই কাজটি নিচ্ছ না, তা'হলে বলবো—ভুল করছ তুমি।

আশান্বিত হলো মন—মিথ্যে বলছে না সে। তবু, তার প্রেমের অকাট্য প্রমাণ পেতে চাই !

সে যেন বুঝলো আমার মনের কথা। বাহু-বন্ধন শিথিল করে চুপি চুপি বলল, একটি চুমো খাও না—খাবে না বুঝি ?

চুমো খাবার জন্য তুলে ধরলাম তার মুখখানি।

এ কী ! তার মুখে অবসাদের ছাপ। সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—আমায় আদর করে, বুকে নিয়ে ও আমার সঙ্গে কথা বলে। তার চিবুকটি ধরে ঠোঁটের কাছে ঠোঁট আনলাম।……

ক্রীং ক্রীং…

টেলিফোন বেজে উঠলো।

"বাত্তিসতা" !…

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেল এমিলিয়া। সোফার উপর বসে রইলাম আমি। খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম। রিসিভারটি তুলে নিল এমিলিয়া। দু'একটি কথার পর বলল, হ্যাঁ… হ্যাঁ… বাড়িতেই রয়েছে…এক্ষুনি দিচ্ছি তাকে…আপনি কেমন আছেন …আমরা এতক্ষণ আপনার আগামী ছবি সম্বন্ধে বলছিলাম…শিগগিরই দেখা হবে ……আচ্ছা……এবার আপনার রিকর্ডোর সঙ্গে কথা বলুন, মিঃ বাত্তিসতা।…

এগিয়ে এসে রিসিভারটি ধরলাম।

বাত্তিসতা বললেন—পরের দিন যেন তাঁর আপিসে যাই। বললাম, যাবো। তারপর দু'একটি মামুলি কথা বলে রিসিভারটি রেখে দিলাম সশব্দে।

দেখলাম, ইতোমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে এমিলিয়া। সে তার কাজ হাসিল করেছে—বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা করতে রাজী করিয়েছে আমাকে। এখন তার উপস্থিতি কিংবা সোহাগের প্রয়োজন নেই আর।

সপ্তম অধ্যায়

পরদিন যথাসময়ে বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

একটি পুরনো আমলের বাড়ির দোতালায় বাত্তিসতার আপিস। বড় বড় থাম, পুরু দেয়াল আর চেহারা দেখেই বোঝা যায় এ বাড়িতে কোন অভিজাত পরিবার বাস করতেন একদিন। এখন অনেকগুলি ছোট-বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এখানে। প্রশস্ত ঘরগুলিকে কাঠের "পার্টিশান" দিয়ে ছোট ছোট কামরা করা হয়েছে। কামরায় আলো-হাওয়া নেই, সেগুলিকে তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও দেখায় না বাইরে থেকে।

চিত্র-নির্মাতা বাত্তিসতা এখনও বয়সে তরুণ। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ উন্নতি করেছেন। তাঁর তৈরী ছবিগুলো তেমন উঁচু দরের না হলেও, তা' থেকে আয় হয়েছে প্রচুর। তাঁর চিত্র-প্রতিষ্ঠানের নাম হলো—"বিজয় ফিল্মস্"। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-প্রতিষ্ঠান এটি।

বাইরের ঘরে বেশ ভিড় জমেছে তখন। এ লাইনে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। মুখ দেখেই লোক চিনতে পারি, বলতে পারি—কে কি উদ্দেশ্যে এসেছে। ভিজিটারদের উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম একবার। দেখলাম, তার মধ্যে রয়েছেন—দু' তিনজন চিত্র-নাট্যকার। ক্লান্ত ও অধ্যবসায়ী দৃষ্টি, বগলের খাতা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও হাবভাব দেখেই চিনলাম তাঁদের। দু' তিনজন সিনেমা অর্গানাইজার বা সিনেমা ম্যানেজারকেও দেখলাম। গ্রাম্য নায়েব কিংবা দালালের মতো তাঁদের চেহারা। দু'তিনটি মেয়েও চোখে পড়লো। ওরা হচ্ছে ভাবী অভিনেত্রী। তরুণী ও সুন্দরী হলেও ভাব-ভঙ্গিমায়, অতিরিক্ত প্রসাধনে ও পোশাকের চাকচিক্যে কিম্ভুতকিমাকার দেখাচ্ছিল তাদের। তা'ছাড়া রয়েছে আরো সব লোক—যাদের সর্বদাই এসব যায়গায় দেখা যায়, অথচ ঠিক বর্ণনা দেওয়া যায় না। যেমন—বেকার, অভিনেতা, পরামর্শদাতা, আর্টিষ্ট, মিস্ত্রী ইত্যাদি। এরা পায়চারি করছিল, চেয়ারে বসে বসে হাই তুলছিল, ধূম পান করছিল, গল্প-গুজব করছিল।......সামনে বসে আছেন দু'টি মহিলা। ঘন ঘন টেলিফোন বেজে উঠছে, টেলিফোনে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন তাঁরা। টেলিফোন বন্ধ হলে চুপ করে বসে কখনও উদাস দৃষ্টিতে কখনও বা আড়চোখে তাকাচ্ছেন ভিজিটারদের দিকে। মাঝে মাঝে জোরে "বেল" বেজে উঠছে, তাঁরা এক একজন ভিজিটারের নাম ধরে ডাকছেন, আর ডাক শুনে লাফিয়ে উঠে শাদা ও সোনালী দরজার ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন এক একজন ভিজিটার।

আমার নামটি লিখিয়ে দিয়ে ঘরের শেষ প্রান্তে গিয়ে বসলাম। অপরিবর্তিই রয়েছে আমার মনোভাব। ভেবে দেখেছি—এমিলিয়া আমায় ভালবাসে না—একথা সত্য নয়। তবু স্থির করেছি ব্যক্তিসত্তার

নতুন কাজটি করবো। এমিলিয়ার কাছ থেকে তার মনের কথা জেনে নিয়ে কাজ ছেড়ে দিতে পারবো দরকার হলে। কোন অসুবিধা হবে না তা'তে। এ সমাধানটিই বেশী নাটকীয় হবে মনে হলো। কেলেঙ্কারী ও আর্থিক ক্ষতির ফলে নৈরাশ্য আসবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনের সংশয় ও আপোষের আকাঙ্ক্ষা দূর হবে।

অনেকটা শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছি। কিন্তু জানি, এ অবস্থা থাকবে না আর—বেদনা, বিষণ্ণতা ও বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠবে মনে। এ যেন বজ্রপাতের পূর্ব মুহূর্তের স্তব্ধতা। এতক্ষণ শুধু ভেবেছি—এমিলিয়া আমায় ভালবাসে কিনা। এবার মনে হলো—না, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই আবিষ্কারে। কিন্তু কেন—কেন সে ভালবাসে না আমায়? তার অবজ্ঞার কারণ জানতে পারলেই জোর করে কৈফিয়ৎ আদায় করা যাবে তার কাছ থেকে।

তবু, বিশ্বাস হলো না। না না—এ সম্ভব নয় কিছুতেই। আমাকে তার ভাল না লাগার কোন কারণই থাকতে পারে না! কোথা থেকে এলো এই দৃঢ় বিশ্বাস? তবে হ্যাঁ, অকারণেই সে আমায় ভালবাসে না। অবশেষে মনে মনে বললাম,—ধরা যাক্, কোন কারণ নেই—যদিও কারণ একটা থাকতেই হবে। এবার দেখা যাক—কারণটা কী হতে পারে? সংশয় যেখানে বেশি সেখানেই মানুষ মনের মিথ্যা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকে, মনের আবেগে যা কিছু অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে তা'ই যেন যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে চায়।......

রহস্য কাহিনীর গোয়েন্দার মতো তদন্ত করবো আমি।

একটি খুন হয়েছে: কিন্তু কেন খুন করা হলো—খুনের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে পারলেই অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যাবে।

এমিলিয়া আমাকে ভালবাসে না: তার উদ্দেশ্য কি?……সে হয়তো আর কাউকে ভালবাসে।

…এ ধারণা সহজেই নাকচ করে দেওয়া যেতে পারে। তার ব্যবহারে এতটুকুও সন্দেহ হয় না যে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছে আর কেউ। বরং দেখা গেছে সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রায়ই সে একেলা থাকে, আমার উপর নির্ভর করে বেশি। সারাক্ষণ ঘরে থাকে, এক-আধটু পড়াশুনা করে, কখনও বা মাকে টেলিফোন করে, আমাকে ছাড়া বাইরে যেতে পারে না। দু'একজন বান্ধবী ছিল তার। বিয়ের পরেও কিছুদিন বন্ধুত্ব বজায় ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রীতির বাঁধন ছিড়ে গেল, সে আমাকেই আঁকড়ে ধরে রইল, আমারই উপর একান্তভাবে নির্ভরশীলা হলো। বিরক্তি বোধ করছিলাম তা'তে, তবু তার নির্ভরতা কমলো না এতটুকু, আর কাউকে খুঁজলো না এমিলিয়া।……আজও সে ঠিক তেমনি করেই আমার প্রতীক্ষায় থাকে, নির্ভর করে আমারই উপর—শুধু ভালবাসাটুকু নেই আর। এই প্রেমহীন নির্ভরতার মধ্যে রয়েছে এক করুণ বিষণ্ণতা,—যেন বিশ্বাসের কারণ নেই অথচ সে বিশ্বাসী হয়ে রয়েছে তার স্বভাবগুণে। এক কথায়, আমার উপর ভালবাসা না থাকলেও এটা প্রায় নিশ্চিত যে আমি ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের স্থান নেই এমিলিয়ার জীবনে। এ ছাড়া আরো একটি প্রমাণ আছে: মিথ্যা বলতে পারে না এমিলিয়া। সে সরল, মিথ্যা তার অসহ্য। তার কল্পনা-শক্তি নেই, যা সত্য নয় কিংবা যার কোন অস্তিত্ব নেই তা' সে বানিয়ে বলতে পারে না। এই হ'লো তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাই সন্দেহ রইল না—কারো প্রেমে পড়লে সে আমায় সব খুলে বলতো। তার উপর আমার আচরণ সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করছে না সে। চুপ করে থাকা একটুও কঠিন নয় তার পক্ষে। একেবারে

অসম্ভব না হলেও সহজে সে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে পারে না। তার ঔদাসীন্যের মানে আর একজনের ওপর আকর্ষণ নয়। কারণ যদি কিছু থাকে, তবে তা' খুঁজতে হবে—তার জীবনে নয়, আমারই জীবনে।…

চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। শুনতেই পাচ্ছিলাম না— আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাত্তিসতার সেক্রেটারী মুচকি হেসে বার বার বলছেন, মিঃ মলটেনি, আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন ডাঃ বাত্তিসতা।

প্রকৃতিস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলাম।…..

সুসজ্জিত সুন্দর একটি ঘরে বসেছিলেন বাত্তিসতা। ঘরের ছাদ ও দেয়াল চকচক করছে। বাত্তিসতার সামনে রয়েছে একটি পেতলের টেবিল।

বাত্তিসতা লম্বা নন, কাঁধ দু'টি বেশ চওড়া—দেহটাও স্থূল, পা দু'টি তুলনায় সরু ও ছোট। বানরের সঙ্গে তাঁর এই সাদৃশ্যের জন্য সবাই তাঁকে বলতো—"বানর", "গরিলা" আরও কত কী। কিন্তু আমি কখনও তাঁকে ও-নামে ডাকতে পারিনি—ভালো লাগেনি আমার।…বাত্তিসতার মাথায় টাক, ভুরু দু'টি পুরু, চোখ ছোট, মোটা নাক, মুখের উপরও কোন বৈশিষ্ট্য নেই, ভুরির উপরের দিকটা বুকের সঙ্গে এসে লেগেছে, হাত দু'খানি খাটো, সারা গায়ে কালো কালো কেশ। বন্য পশুর মতো দেখায় তাঁকে। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর, উচ্চারণ স্পষ্ট ও সুন্দর। কথা শুনলেই বোঝা যায়—তিনি বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি।

একা ছিলেন না বাত্তিসতা। তাঁর সামনা-সামনি বসেছিলেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন বাত্তিসতা: ইনি হচ্ছেন রেনগোল্ড.……

প্রথম সাক্ষাৎ হলেও নাম শুনেই চিনলাম তাঁকে। প্রাক্ মহাযুদ্ধের যুগে জার্মান চিত্র-নির্দেশক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন তিনি। তাঁরই নির্দেশিত চিত্রগুলি পেশাদারী বা মামুলি চিত্র নয়—বেশ গুরু-গম্ভীর। হিট্‌লারের অভ্যুদয়ের পর তাঁর নাম শোনা যায়নি আর। তিনি নাকি "হলিউড"-এ ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বাক্ষরিত কোন ছবি আজো ইতালীতে প্রদর্শিত হয়নি।

আমার সঙ্গে করমর্দনের জন্য উঠলেন রেনগোল্ড। বিনীত সম্ভাষণ জানিয়ে বসলেন আবার।

বাত্তিসতা বললেন, রেনগোল্ড ও আমি বলছিলাম ক্যাপ্রির কথা··· ক্যাপ্রি জানেন তো, মিঃ মলটেনি?

: হ্যাঁ।

বাত্তিসতা বললেন, জানেন—সেখানে আমার একটি বাগান-বাড়ি আছে···এইমাত্র রেনাগোল্ডকে বলছিলাম···সত্যিই কী মনোরম সে যায়গাটি·········এমন যায়গা—যেখানে গেলে আমার মতো নীরস পাকা ব্যবসায়ীরও কাব্য-চর্চা করতে ইচ্ছে করবে—সব ছেড়ে দিয়ে।

সৌন্দর্য ও আদর্শের উপর এমনি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ দেখানোই বাত্তিসতার অভ্যাস। কিন্তু তাঁর এ আগ্রহ অকপট হলেও যেন একেবারে নিঃস্বার্থ নয়। বিচলিত বোধ করলাম তাই। একটু পরেই নিজের কথায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে আবার বাত্তিসতা বললেন, নয়নাভিরাম প্রকৃতি, উদার স্বচ্ছ আকাশ, চির নীল সমুদ্র···আর অজস্র ফুল—সর্বত্র ফুলের অপূর্ব সমারোহ······আপনার মতো লেখক হলে আমি ক্যাপ্রিতেই বাস করতাম আর প্রকৃতি থেকে প্রেরণা নিতাম···সত্যিই অবাক লাগে···শিল্পীরা ক্যাপ্রির প্রাকৃতিক দৃশ্য না এঁকে এমন সব

ছবি আঁকে—যার কোন মানে হয় না···বলতে গেলে, ক্যাপ্রিতে ছবি আঁকাই রয়েছে—স্বধু ক্যামেরায় ধরে নেওয়া।···

কোন কিছু না বলে রেসগোল্ডএর দিকে চাইলাম আড়চোখে। দেখলাম, ঘাড় নেড়ে বাত্তিসতার কথায় সায় দিলেন তিনি। আকাশে বাঁকা চাঁদের মতো দেখালো তাঁর হাসি। বাত্তিসতা বলতে লাগলেন, জানেন, এক এক সময় ভাবি—কাজকর্ম ছেড়ে কিছুদিন সেখানে গিয়ে থাকি, কিন্তু সময় করে উঠতে পারি না···এখানে—শহরে আমরা যে জীবন-যাপন করি তার সঙ্গে সেখানকার প্রকৃতির কোন মিলই নেই··· দপ্তরের নথিপত্রের মধ্যে সময় কাটিয়ে দেবার জন্যই তো মানুষের জন্ম নয়···তা'ছাড়া, ক্যাপ্রির লোকেরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী সুখী··· বিকেলে তরুণ-তরুণীরা উচ্ছল হাসিতে চারদিক মুখর করে সুখে ঘুরে বেড়ায় প্রজাপতির মতো···কী অপূর্ব সেই দৃশ্য···তাদের জীবন এমন আনন্দসুখময় কেন জানেন?···ওরা উচ্চাভিলাষী ও স্বার্থপর নয়, তাই ওদের দুঃখ ও অভাবের মাত্রাও কম···সত্যিই কী সুখী তারা!···

কিছুক্ষণ নীরব রইলেন বাত্তিসতা, তারপর আরম্ভ করলেন আবার: যা' বলছিলাম···আমার একটি বাগান-বাড়ি আছে কাপ্রিতে···আমি কখনও যাইনি সেখানে···কী দুর্ভাগ্য দেখুন তো···বাড়িটা যখন নিয়েছি—অন্ততঃ কিছুদিন তো সেখানে থাকা দরকার···তাই রেনগোল্ডকে বলছিলাম—চিত্র-নাট্য রচনার পক্ষে ক্যাপ্রিই হবে সর্বোত্তম স্থান···বাইরের প্রকৃতি থেকে প্রেরণা পাওয়া যাবে যথেষ্ট···বিশেষ করে—রেনগোল্ডকে বলছিলাম—সেখানকার বহিপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্রের বিষয়-বস্তুর মিল রয়েছে!

রেনগোল্ড বললেন, দেখুন বাত্তিসতা, কাজ যেখানে খুশি করা যায়······তবে, ক্যাপ্রি আমাদের কাজের পক্ষে বিশেষ

উপযোগী হতে পারে—যদি কয়েকটি "শট" নেপল্‌স্‌ উপসাগরে গিয়ে নেওয়া যায়।

: নিশ্চয়···রেনগোল্ড বলছেন, তিনি কোন হোটেলে উঠবেন ···তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধে রয়েছে কতগুলো···তা'ছাড়া, নিরালায় থেকে নিজের কাজের কথা ভাবতে ভালো লাগে তাঁর··· তা' আপনি ও আপনার স্ত্রী আমার বাগান বাড়িতে গিয়ে থাকুন না, মিঃ মলটেনি ·· অন্ততঃ কেউ সেখানে থাকলে আমি খুশি হবো···অসুবিধে কিছু হবে না···সব সুবিধে রয়েছে সেখানে—ঝি-চাকর পেতে কোন কষ্ট হবে না।······

এমিলিয়ার কথা মনে পড়লো আমার। ভাবলাম, ক্যাপ্রির মনোরম পরিবেশের মধ্যে সেই বাগান-বাড়িতে গেলে অনেক অসুবিধেই কমে যাবে। কেন জানি না, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হলো আমার ধারণা।

বাত্তিসতাকে ধন্যবাদ জানালাম তাই। বললাম, চিত্রনাট্য-রচনার পক্ষে ক্যাপ্রিই যে প্রশস্ত এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই··· আপনার বাগান-বাড়িতে বাস করতে পারলে আমি ও আমার স্ত্রী দু'জনেই আনন্দিত হবো।

আমার হাত ধরে উত্তেজিতভাবে বাত্তিসতা বললেন, বাঃ বেশ··· তা'হলে আপনারা ক্যাপ্রিতে যাবেন, আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবো সেখানে···বেশ—বেশ, এবার আমাদের চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক······

চেয়ে রইলাম বাত্তিসতার মুখের দিকে।

কেন তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম? আমার এ হঠকারিতা নিশ্চয় সমর্থন করবে না এমিলিয়া। সত্যিই, এমন আগ্রহ দেখানো ঠিক হয়নি। বলা উচিত ছিল—ভেবে দেখি। লজ্জা বোধ করলাম তাই।

বাত্তিসতা বললেন, আমরা সবাই একমত যে চিত্র-শিল্পে নূতনত্ব আমদানি করতে হবে…যুদ্ধোত্তর যুগ শেষ হয়েছে…লোকে এখন নতুন জিনিস চায়…সকলেই অতি আধুনিক বাস্তবতায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে…কেন আমরা আধুনিক বাস্তবধর্মী চিত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছি?…তার কারণ কী?…একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবো—কী চায় আজকের দর্শক সমাজ?

প্রত্যক্ষ আক্রমণের পক্ষপাতী নন বাত্তিসতা। তিনি ছিদ্রান্বেষী নন—হয়তো নিজেকে সেভাবে প্রকাশ করতে চান না। তাই স্পষ্টভাবে কিছু না বলাই তাঁর স্বভাব। অন্যান্য চিত্র-নির্মাতাদের মতো লাভের দিকে তাঁর ষোল আনা নজর থাকলেও ভাব দেখান অন্য রকম। যেমন ধরুন: কোন চিত্রের বিষয়-বস্তু পছন্দ না হ'লে সবাই সাধারণতঃ বলে 'এতে পয়সা আসবে না'। কিন্তু ঠিক তেমন স্পষ্ট ভাষায় ও-কথাটি বলেন না তিনি। বলেন, এই এই কারণে বিষয়বস্তুটি আমার ভালো লাগছে না। এমন সব যুক্তি দেখান—যা শুনে মনে হয় হিতোপদেশ দিচ্ছেন।

একটু ভেবে বাত্তিসতা বললেন: আমার মতে, লোকে এখন আর একঘেয়ে উগ্র আধুনিক বাস্তবধর্মী চিত্র পছন্দ করে না, কেন না ও-সব ছবি 'স্বাস্থ্যকর' নয়।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার রেনগোল্ডএর দিকে চাইলেন তিনি। নিষ্পলক তাঁর দৃষ্টি। হয়তো 'স্বাস্থ্যকর' কথাটির উপর জোর দেবার জন্যই, একটু থেমে বাত্তিসতা বললেন, আধুনিক বাস্তবধর্মী চিত্র ভালো নয়—এ ধরণের ছবি মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা দেয় না, জীবনের উপর আস্থাবান করে তুলতে পারে না…ছবির মধ্যে থাকে শুধু হতাশা, দুঃখবাদ ও নিরাশা …জীবনের অন্ধকার দিকটাই প্রতিফলিত হয় সেখানে…মানুষ ও

মানব জীবনের কদর্যতম, অস্বাভাবিক অবস্থার উপরই আধুনিক চিত্র নির্মাতারা জোর দেন বেশি…এ সব ছবি সুস্থ আনন্দময় জীবন-যাপনের পথ নির্দেশ করে না।…

চেয়ে দেখলাম বাত্তিসতার মুখের দিকে। ঠিক বুঝতে পারলাম না—তিনি যা বলছেন, তা' নিজে বিশ্বাস করেন কিনা। তবে হ্যাঁ, তাঁর উক্তির মধ্যে আন্তরিকতা রয়েছে।

বাত্তিসতা বললেন : রেনগোল্ড একটি প্রস্তাব করেছেন…প্রস্তাবটি মন্দ লাগেনি আমার·· তিনি বলেছেন, আজ পর্যন্ত বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে যেক'টি ছবি তৈরী হয়েছে—সবগুলিই বেশ সফল হয়েছে… কেন ?…কারণ বাইবেলের মতো সরস ও দীপ্ত আর কিছু নেই… তাই রেনগোল্ড বলেছেন—অ্যাংলো-স্যাক্সনদের বাইবেল, আর ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের জাতিপুঞ্জের "হোমর"—তাই না ?

মুচকি হেসে রেনগোল্ড বললেন, নিশ্চয়…নিশ্চয়…

বাত্তিসতা বললেন, উনি বলেছেন—আপনাদের—মানে ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের জাতিপুঞ্জের—কাছে 'হোমর' অ্যাংলো স্যাক্সনদের "বাইবেল"-এর মতো…যেমন ধরুন, হোমরের "ওডিসি"…"ওডিসি"র চিত্র-রূপায়ণ করেন না কেন আপনারা ?…

চুপ করলেন তিনি। অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম, গোটা 'ওডিসি', না তার কোন একটি উপাখ্যান ?

বাত্তিসতা বললেন, সে সম্বন্ধেও আলোচনা করেছি আমরা…ঠিক করেছি, গোটা ওডিসিটা নিলেই ভালো হয়…কিন্তু সেটা বড় কথা নয়…। তারপর ঘাড় তুলে বললেন : …বড় কথা হলো—'ওডিসি'টা আর একবার ভালো করে পড়া…এবার বুঝেছি—এতদিন কী চেয়েছি অথচ বুঝতে পারিনি…বুঝেছি—অতি বাস্তবধর্মী চিত্রে কোন্

জিনিসটার সত্যিকারের অভাব…যেমন আপনি যে-সব বিষয়বস্তুর কথা বলেছেন, তার মধ্যে যা কখনও পাইনি—এমন একটি জিনিস—যা অনুভব করছি অথচ প্রকাশ করতে পারছি না, যা জীবনে ও চিত্র-শিল্পে সমান প্রয়োজনীয়—সেটা হলো কাব্য।

রেনগোল্ড-এর ঠোঁটে হাসি মিলায়নি তখনও। সাহসে ভর করে বললাম, 'ওডিসি'তে কাব্যের অভাব নেই, অসুবিধে হলো—তার চিত্র-রূপায়ণ…

বাত্তিসতা বললেন, বেশ তো, সে-কাজের জন্য আপনারা রয়েছেন না,—আপনি ও রেনগোল্ড? জানি, কাব্য রয়েছে…আপনারা সেই কাব্য-রস-টুকু আহরণ করবেন।

বললাম ঃ 'ওডিসি' হলো একটি স্বতন্ত্র জগৎ…সেখান থেকে লোকে যা চায়, তা'-ই পেতে পারে ‥তবে সেটা নির্ভর করে—রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর।

আমার উৎসাহের অভাব দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন বাত্তিসতা। খুঁজে পেলেন না আমার ঔদাসীন্যের কারণ। চেয়ার থেকে উঠে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে করতে বললেন ঃ 'ওডিসি' পড়ে আমার মনে হয়েছে—তার কাব্য-সৌন্দর্য অতুলনীয় অপরূপ…সেখানে এমন সব দৃশ্য রয়েছে যার আবেদন সর্বজনীন…"বিজয় ফিল্মস্" আধুনিক রুচির উপযোগী করে ফুটিয়ে তুলবে 'ওডিসি'র সেই অভিনব দৃশ্যগুলি।

চুপ করে রইলাম। বুঝলাম, কাব্য বলতে আমি যা বুঝি, বাত্তিসতার ধারণা তা' নয়। তাঁর "বিজয়-ফিল্মস্-এর 'ওডিসি' হবে—হলিউড থেকে বাইবেল অবলম্বনে যে-সব ছবি বেরোয় ঠিক তেমনি। মূলের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্কই থাকবে না। সেখানে থাকবে

দৈত্য-দানব, নগ্ন নারী, নারী হরণ, পাপ ও দুষ্কার্যের দৃশ্য, প্রেম, প্রতিহিংসা, বাগাড়াম্বর। এর অন্যথা হবে কেমন করে?

চেয়ারে বসে বাত্তিসতা বললেন, আপনি কি বলেন, মিঃ মলটেনি?

চিত্রনাট্য-রচয়িতা হিসাবে অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। এ ছবি শেষ হতে পারে না কখনও। কাজ করবো, অথচ শেষ পর্যন্ত টাকা পাবো না। তাই ভাবলাম, আগেই সতর্ক হওয়া দরকার। বললাম, "আইডিয়াটি'তো ভালো বলেই মনে হয়।

: কিন্তু আপনার তেমন আগ্রহ দেখছি না কেন?

: আমি ভাবছি—বিষয়-বস্তুটি আমার পক্ষে একটু কঠিন হবে··· আমি হয়তো পারবো না···আমার ক্ষমতায় কুলোবে না।

উত্তেজিত হয়ে বাত্তিসতা বললেন, কেন···আপনি তো ভালো ছবির কথা বলতেন··এখন আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি, আর আপনি পিছিয়ে পড়ছেন?

: দেখুন বাত্তিসতা, মনস্তত্ত্ব-মূলক চিত্রই আমার ভালো লাগে··· আমার মনে হয়, আপনাদের প্রস্তাবিত চিত্রে সুধু দৃশ্য ছাড়া আর কিছু নেই।

জবাব দিতে পারলেন না বাত্তিসতা। রেনগোল্ড হঠাৎ বলে উঠলেন, মিঃ বাত্তিসতা চিত্রটি সম্বন্ধে বিশদভাবে সবই বলেছেন···অবশ্যি তিনি বলেছেন, চিত্রনির্মাতা হিসাবে···তাই আপনাকে ঠিক বুঝাতে পারেননি···কিন্তু আপনি যদি মনস্তত্ত্ব চান, তাহ'লে নিঃসন্দেহে কাজটি নিতে পারেন, কেন না চিত্রের কাহিনীর মধ্যে ইউলিসিস ও পেনিলোপ-এর মনস্তত্ত্ব গৌণ নয়—মুখ্য···আমি ছবি তুলবো এমন একটি লোক নিয়ে—যে তার স্ত্রীকে ভালবাসে, কিন্তু স্ত্রীর ভালবাসা পায় না বিনিময়ে।···

মুচকি হাসলেন মিঃ রেনগোল্ড, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর মুখমণ্ডল। কী বলবো ঠিক করতে পারলাম না। বলতে চাইলাম: পেনিলোপ ইউলিসিসকে ভালবাসে না—একথা সত্য নয়। চিত্র-নির্দেশক রেনগোল্ড-এর কথা মনে পড়লো—'যে তার স্ত্রীকে ভালবাসে, কিন্তু স্ত্রীর ভালবাসা পায় না বিনিময়ে।' এমিলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাও মনে পড়লো। মনে প্রশ্ন জাগলো: এমিলিয়া আমায় ভালবাসে না কেন?

কল্পনা-নয়নে দেখলাম:...

আমি বসে আছি পড়ার ঘরে...একটি চিত্রনাট্য লিখছি...ক'দিন ধরে কাজটি চলেছে, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কাজ...এতদিন কাজের ব্যস্ততায় আমার টাইপিষ্ট গার্লটির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি একবারও।...সে কী একটা লাইন টাইপ করছিল, তার পেছন থেকে কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলাম—একটি ভুল হয়েছে।... টাইপ মেশিনের চাবি টিপে ভুলটি সংশোধন করতে চাইলাম। হঠাৎ তার হাতে হাত লাগলো। হাতটি সরিয়ে নিল সে। নিজে একটি নতুন শব্দ টাইপ করলাম। এবার ইচ্ছে করেই তার আঙুল স্পর্শ করলাম, তাকালাম তার মুখের দিকে। দেখলাম, সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে—যেন নীরব আহ্বান জানাচ্ছে। চোখাচোখি হ'তেই বলল, মাফ্ করবেন, ভুলটা চোখে পড়েনি। শুষ্ক, স্পষ্ট তার স্বর। তার দিকে তাকালাম আবার। ভাবলাম, আমি কি কোন আবেগ দেখিয়েছি?...সেদিন থেকে কয়েকদিন দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কাটালাম। অবশেষে সে যা চেয়েছিল তাই হ'লো।...সেদিনও একটি ভুল সংশোধন করছিলাম: দৃষ্টি-বিনিময় হ'লো দু'জনের, ব্যাকুল চঞ্চলভাবে তার রাঙা ঠোঁটে একটি চুমো খেলাম। চুমো খাবার পর

সে বলল, বাব্-বাঃ!···এতদিনে!···ভেবেছিলাম—কখনো আপনার ইচ্ছাই হবে না।······সে যেন ভাবলো—আমায় মুঠোর মধ্যে পেয়েছে। মুখ নীচু করে টাইপ করতে লাগলো আবার। বিব্রত বোধ করলাম। মেয়েটি লোভনীয় নিশ্চয়। নইলে তাকে চুমো খেলাম কেন? তাছাড়া, জানি তাকে ভালবাসি না, আমার কাছ থেকে সে জোর করেই চুমো আদায় করেছে, খর্ব করেছে আমার পৌরুষের অভিমান। দেখলাম, সে নির্বিকারভাবে টাইপ করে যাচ্ছে। অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। ইচ্ছে করেই যেন আর একটি ভুল করলো মেয়েটি। আবার ঝুঁকে পড়লাম ভুলটি সংশোধন করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমার অস্থিরতা তার চোখ এড়াতে পারলো না। মুখটি মুখের কাছে আসতেই সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে রইলাম দু'জনে।···ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল, এমিলিয়া ঘরে ঢুকলো, তারপর তক্ষুনি দরজা বেঁধে দিয়ে বেরিয়ে গেল।······

মেয়েটিকে বললাম, আজ থাক······এবার বাড়ি যাও।···

শোবার ঘরে এলাম শঙ্কিতচিত্তে। ছিঃ ছিঃ, কী ভাবছে এমিলিয়া? হয়তো মেয়েটির উপর ঈর্ষার ভাব লেগেছে তার। কিন্তু আমায় দেখে এমিলিয়া বলল, ঠোঁটের লাল রঙটা অন্ততঃ মুছে ফেল।

রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে বসলাম তার পাশে। প্রমাণ করতে চাইলাম—আমি নির্দোষ। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলো এমিলিয়া। বলল, সত্যিই যদি ওই টাইপিষ্ট-গার্লটির প্রেমে পড়ে থাক—দয়া করে আমায় বললেই পার······বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব আমি সানন্দে মেনে নেবো।······

করুণ, বিষাদ-মাখা তার কণ্ঠস্বর। সে যেন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চায়! কত বুঝালাম তাকে। বললাম, অন্যায় হয়েছে আমার······

আমায় ক্ষমা কর···সাময়িক উত্তেজনা ও দুর্বলতার জন্য ভুল বুঝো না······

সে শুনতেই চাইল না কোন কথা। অবশেষে আমায় ক্ষমা করতে রাজী হলো।···

এমিলিয়া ছেড়ে যাবে আমায়—এ যে কল্পনাতীত! সেদিনই এমিলিয়ার সামনে মেয়েটিকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম—তাকে প্রয়োজন নেই আর। বাইরে কোথাও আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল মেয়েটি, কিন্তু এড়িয়ে গেলাম তাকে। আর কখনও দেখা করিনি তার সঙ্গে।······

বিজলী ঝলকের মতো এ দৃশ্যটি আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছিল: টাইপিষ্ট-গার্ল'কে চুমো খাচ্ছি, ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলছে এমিলিয়া······

আগে একথা ভাবিনি কেন?

এমিলিয়া তখন দেখিয়েছে—ঘটনাটিকে সে আমলই দেয়নি, কিন্তু আসলে অজ্ঞাতসারে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার অন্তর। সে নীরবে মেনে নিয়েছিল—ওটা আমার সাময়িক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু ব্যথা পেয়েছিল তা'তে। · ··

স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছিলাম। ঘন কুয়াশার মায়াজাল ছড়িয়ে ছিল আমার চারদিকে।

হঠাৎ রেনগোল্ড-এর কণ্ঠস্বর শুনলাম: শুনছেন, মিঃ মলটেনি!

ছিঁড়ে গেল কুয়াশার আবরণ। গা নাড়া দিয়ে উঠলাম।

বাত্তিসতার হাসিমাখা মুখখানি দেখলাম আমার সামনে। বললাম, ক্ষমা করুন······ভাবছিলাম—রেনগোল্ড-এর সেই কথাটি—'যে

তার স্ত্রীকে ভালবাসে, কিন্তু স্ত্রীর ভালবাসা পায় না বিনিময়ে'······কিন্তু ···কিন্তু······

ভেবেই পেলাম না, কী বলবো আর। তবু, আমার নিজের মত প্রকাশ করলাম : কিন্তু······কাব্যের ইউলিসিসকে ভালবাসে তার পত্নী পেনিলোপ ·····এক হিসেবে, ইউলিসিসের প্রতি পেনিলোপের প্রেমই হলো সমগ্র 'ওডিসি'র ভিত্তি।······

স্মিতহাস্যে আমার এ উক্তি খণ্ডন করলেন রেনগোল্ড : প্রেম নয় মিঃ মলটেনি, আনুগত্য······পেনিলোপ ইউলিসিসের অনুগতা, কিন্তু আমরা জানি না, সে কতখানি ভালবাসতো তাকে···আপনি তো জানেন, প্রেম না থাকলেও আনুগত্য থাকা অসম্ভব নয় ·····কোন কোন ক্ষেত্রে আনুগত্যও একরকম প্রতিহিংসা—জোর করে ভালবাসা আদায় করা। আনুগত্য আর প্রেম এক নয়···

সত্যিই তো! এমিলিয়ার কথা মনে পড়লো আবার। আনুগত্য ও ঔদাসীন্যের যায়গায় যদি হতো বিশ্বাসঘাতকতা—তা'হলেও দুঃখ থাকতো না। যদি অবিশ্বাসিনী এমিলিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম! কিন্তু তার বদলে আমিই যে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি তার কাছে।

কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল মন। চঞ্চল হয়ে উঠলাম বাত্তিসতার কণ্ঠস্বরে : তা'হলে আপনি রেনগোল্ড-এর সঙ্গে কাজ করতে রাজী আছেন, মিঃ মলটেনি?

: হ্যাঁ ·····হ্যাঁ······রাজী,

উল্লাস ও তৃপ্তিভরে বাত্তিসতা বললেন, বেশ বেশ, এই তো চাই··· তা'হলে সে-ভাবেই ব্যবস্থা করে ফেলি······রেনগোল্ড কাল সকালেই প্যারিসে যাচ্ছেন, এক সপ্তাহ থাকবেন সেখানে···আর আপনি ইতিমধ্যে

'ওডিসি'র একটি সংক্ষিপ্ত-সার তৈরী করে ফেলুন······রেনগোল্ড ফিরে এলেই ক্যাপ্রি চলে যাবো আমরা······অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করে ফেলবো······

উঠে দাঁড়ালেন রেনগোল্ড। আমিও উঠলাম যন্ত্র-চালিতের মতো। দরজার দিকে এগোবার সময় অস্পষ্ট কণ্ঠে বললাম, আমার চুক্তিপত্রটা—

অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিতে নির্লিপ্ত স্বরে বাত্তিসতা বললেন, চুক্তিপত্র তো তৈরী হয়েই আছে···তা'ছাড়া, সঙ্গে সঙ্গে আপনার পারিশ্রমিকটাও দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে······শুধু একবার সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে সই করে টাকাটা নিতে হবে আপনাকে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে একটিবার আলোচনা পর্যন্ত না করে টাকা দিয়ে ফেলছেন বাত্তিসতা। তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানলাম। তারপর সেক্রেটারীর ঘরে গিয়ে চুক্তিনামায় সই করে চেকটি নিয়ে এলাম।

বাত্তিসতা রেনগোল্ড-এর করমর্দন করলেন, তারপর আমার কাঁধ চাপড়ে নতুন কাজে সাফল্যের জন্য তাঁর শুভেচ্ছা জানালেন। বাত্তিসতা দপ্তরে ঢুকলেন। হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে রেনগোল্ড বললেন, প্যারিস থেকে আসার পর দেখা হবে আবার। আপনি সংক্ষিপ্ত-সারটি তৈরী করে রাখবেন—যেন বাত্তিসতার সঙ্গেও সে-সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন।

বললাম, আচ্ছা।

অবাক হয়ে তাঁর দিকে চাইলাম। তিনি যেন একবার আমার আপাদ-মস্তক দেখে নিলেন, লক্ষ্য করলেন আমার দৃষ্টি। তারপর আমায় জড়িয়ে ধরে কানের উপর মুখ রেখে বললেন, কিচ্ছু

ভাববেন না মশায়······বাস্তিসতা যা' বলেন বলতে দিন······আমরা মনস্তত্ত্ব-মূলক ছবিই তুলবো—একেবারে খাঁটি মনস্তত্ত্বমূলক।······

আমার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে, ঘাড় নেড়ে তিনি এগিয়ে চললেন। আমিও সামনের দিকে পা বাড়ালাম। সেক্রেটারীর গলা শুনলাম: দয়া করে এখানে আর একটি সই দিয়ে যান না, মিঃ মলটেনি······

অষ্টম অধ্যায়

বেলা সাতটায় বাড়ি ফিরে ডাকলাম: এমিলিয়া!

কোন সাড়া পেলাম না। বুঝলাম—সে বাইরে গেছে, ঘণ্টা দু'য়েকের আগে ফিরবে না। গভীর হতাশায় বিষিয়ে উঠলো মন।

ভেবেছিলাম, সেই টাইপিষ্ট গার্ল সম্বন্ধে কথা বলবো আজ। সন্দেহ নেই—সেই চুম্বনই অসন্তোষের মূল। কয়েকটি কথা বলে এমিলিয়ার মনের মেঘ কাটিয়ে ফেলবো, তারপর তাকে দেবো সুসংবাদ। বলবো—'ওডিসি' চিত্র-নাট্যের কথা, অগ্রিম টাকা পাওয়ার কথা, ক্যাপ্রিতে যাবার কথা।

এখন মাত্র দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। তবু, অমঙ্গল আশঙ্কা করলাম। দু'ঘণ্টা পরে হয়তো এ মনোবল থাকবে না। চাবি খুঁজে পেয়েছি—অর্থাৎ এমিলিয়া আমায় ভালবাসে না আর! তবু সংশয়। চঞ্চল, বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরে ঢুকে সেলফ্-এর উপর থেকে 'ওডিসির' অনুবাদটি খুঁজে বার করে নিলাম। তারপর টাইপ-রাইটার-এ কাগজ

লাগিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে সংক্ষিপ্ত-সার তৈরী করতে বসলাম। এতেই হয়তো আমার উৎকণ্ঠা কমবে। প্রথম সর্গটি পড়ে নিলাম একবার। কাগজের মাথায় শিরোনামা লিখলাম, "ওডিসির সংক্ষিপ্ত-সার"। নিচে লিখলাম :

…ট্রয়ের যুদ্ধ শেষ হ'য়েছে…যুদ্ধে যোগদানকারী গ্রীক বীরেরা ঘরে ফিরে গেছে…ফিরে গেছে সকলেই, কিন্তু ফেরেননি শুধু একজন… ………তিনি রয়েছেন দূরে—আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে অনেক দূরে……

তারপর ভাবতে লাগলাম—দেবতাদের মন্ত্রণা-সভার উল্লেখ করবো কিনা। বাত্তিসতার কথা মনে পড়লো। তিনি হয়তো চিত্রে দেবতার অবতারণা পছন্দ করবেন না। তা'ছাড়া, রেনগোল্ড ইংগিত করেছেন—চিত্রটি হবে মনস্তত্ত্বমূলক। মনস্তত্ত্বের মধ্যে দেবতা বা নিয়তির স্থান নেই। শ্রান্ত হয়ে উঠলাম, বিক্ষিপ্ত হয়ে এলো চিন্তাধারা। টাইপ করতে চাইলাম, কিন্তু আঙ্গুল সরলো না একটুও। বসে বসে ভাবতে লাগলাম শুধু। নানা চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় করলো। অবসন্ন মন দিশেহারা হ'য়ে পড়েছে, কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছিলাম না তাকে। সরোবরের শান্ত স্থির বুকে যেমন বাষ্প-বুদ্বুদ ওঠে, ঠিক তেমনি আমার মনে জেগে উঠলো একটি নিশ্চিত ধারণা: চিত্রে রূপায়িত করতে হ'লে 'ওডিসি'কে নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে, চিত্রনাট্য লেখা হয়ে গেলেই বইটি অন্যান্য বই-এর সঙ্গে তাক-এ তুলে রাখবো।

বিতৃষ্ণা এসে গেল নিজের এই বৃত্তির উপর। আসবে না? জেনেছি—এমিলিয়া ভালবাসে না আমায়। এতদিন শুধু তাকে খুশি করবার জন্যই কাজ করেছি। আমার উপর তার ভালবাসা নেই আর। এখন কাজ করে কী লাভ?

কতক্ষণ এমনিভাবে বসে জানালার দিকে চেয়ে ছিলাম জানি না। ফ্ল্যাটের বাইরে সামনের দরজা খোলার শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম—এমিলিয়া এসেছে। নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। এমিলিয়া বলল, তুমি এখানে? কী করছ বসে বসে? কাজ করছ বুঝি? পেছন ফিরে দেখলাম একটি পুঁটলি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমিলিয়া। সহজভাবে বললাম, না কাজ করছি না··· ভাবছি, বাত্তিসতার নতুন ছবিটির চিত্র-সম্পাদনার ভার নেবো কিনা।

দরজাটি ঠেলে বন্ধ করে আমার পাশে এলো এমিলিয়া। বলল, বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা করেছ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ চুক্তিনামা হয়েছে? বেশি টাকা দিতে চান না বুঝি?

ঃ না, অনেক টাকা দেবেন···চুক্তিনামা হয়ে গেছে।

ঃ তবে? বিষয়-বস্তুটি কি মনঃপূত হয় নি তোমার?

ঃ না, বিষয়-বস্তুটি বেশ ভালো।

ঃ বিষয়-বস্তুটি কী?

ঃ 'ওডিসি'।

ঃ ওঃ। সেই 'ওডিসি' কী—যেটা স্কুলে পড়ানো হয়? তা' বেশ তো···ওটা করতে চাইছ না কেন তুমি?

ঃ ইচ্ছে হচ্ছে না।

ঃ কিন্তু আজ সকালেও তো ইচ্ছে ছিল তোমার।

এই তো তার সঙ্গে বোঝাপড়ার সুযোগ! চেয়ার থেকে উঠে তার হাতখানি ধরলাম। বললাম, ওঘরে চল, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

ভয় পেলো এমিলিয়া—আমার কথায় নয়, তার হাত ধরেছি বলে। বলল, কী হয়েছে তোমার? এ কী পাগলামো করছ? বল না, কী হ'য়েছে?

: আমি পাগল হইনি···চল—ও-ঘরে গিয়ে বলছি।

সজোরে টানতে টানতে পাশের ঘরে এনে একটি চেয়ারের দিকে ঠেলে দিলাম এমিলিয়াকে। বললাম, বসো। নিজে তার মুখোমুখি চেয়ারে বসে বললাম, শোন এবার।

অসহিষ্ণুভাবে আমার দিকে চেয়ে এমিলিয়া বলল, বল······

তার ভয়ের ভাব কাটেনি তখনও।

: মনে পড়ে, কাল তোমায় বলেছিলাম—তুমি আমায় ভালবাস কিনা ঠিক জানি না বলেই চিত্রনাট্য-সম্পাদনার ভার নেবার ইচ্ছা নেই···তুমি বলেছিলে—আমায় ভালবাস···কাজটি নেওয়া উচিত···না?

: হ্যাঁ।

: কিন্তু আমি বলেছিলাম, আমার ধারণা—মিথ্যে বলেছ তুমি—আমারই প্রতি সমবেদনায়, করুণায় কিংবা নিজের স্বার্থে।

বাধা দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল : কী স্বার্থে?

: তোমার প্রিয় এই ফ্ল্যাটে বাস করার জন্য—

আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সোজা হয়ে বসে চেঁচিয়ে উঠল এমিলিয়া : কে বলেছে তোমায়?···এ ফ্ল্যাট ছেড়ে যে কোন যায়গায় গিয়ে থাকতে রাজী আছি আমি···আমায় জান না তুমি···ফ্ল্যাটটি অতি তুচ্ছ আমার কাছে···

কেউ যদি যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করে কোন উপহার সংগ্রহ করে আর তা' ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন দাতার মনে যে কষ্ট হয়, ঠিক

তেমনি তীব্র বেদনা বোধ করলাম। শুধু এই ফ্ল্যাটটির জন্য কী না করেছি? আদর্শ বিসর্জন দিয়েছি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে চিত্র-সম্পাদকের বৃত্তি নিয়েছি। এ যে আমার স্বপ্নাতীত!

শুষ্ক কণ্ঠে বললাম, ফ্ল্যাটটি কিছুই নয় তোমার কাছে?

: না—না না···বুঝলে?

: কিন্তু কাল বলেছিলে,—এখানে থাকতে চাও তুমি।

: বলেছিলাম, তোমায় খুশি করতে···ভেবেছিলাম, এ-বিষয়ে তোমার নিজেরও আগ্রহ রয়েছে।

বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমার আগ্রহ? সব ছেড়ে দিয়েছি এই ফ্ল্যাট যোগাড় করবার জন্য। সে কি শুধু আমারই আগ্রহে? না, এমিলিয়া প্রতারণা করছে আমার সঙ্গে। প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা হলো না। নিজেকে সংযত করে শান্ত স্বরে বললাম, আচ্ছা, সে-কথা থাক··· ফ্ল্যাটের কথা বলতে চাইনি আমি···বলতে চেয়েছিলাম—আমার প্রতি তোমার মনোভাবের কথা···কাল কোন কারণে বলেছ—আমায় ভালবাস···একথা সত্যি নয়···তাই, একাজে উৎসাহ নেই আর··· কী লাভ কাজ করে?

: কিসে বুঝলে, আমি মিথ্যে বলছি?

: কিসে নয়?······কালও বলেছি সে-কথা··· আজ বলতে চাই না আর······সব কথা তো আর বার বার বলতে হয় না—এমনিই বোঝা যায়······আমি বুঝি, তুমি আর ভালবাস না আমায়।

জানালার দিকে চেয়ে ক্লান্ত বেদনার্ত কণ্ঠে সে বলল, কেন এসব জানতে চাও তুমি?···কেন?···ও নিয়ে মাথা ঘামিও না আর, তা'তেই মঙ্গল হবে দু'জনের।

: বেশ, তা'হলে স্বীকার করছ—আমার কথা সত্যি—

: স্বীকার করি না কিছুই……একটু শান্তিতে থাকতে চাই শুধু……তা'ই দাও ··আমি যাই এবার ·····এখনও জামা কাপড় ছাড়া হয়নি……

উঠে জানালার দিকে এগিয়ে গেল এমিলিয়া। তার হাতটি ধরে ফেললাম। আগেও কতবার এমন করেছি। আমার কাছ থেকে পালাতে চাইলেই তার হাতের কব্জি ধরে ফেলতাম। কিন্তু তখন ধরতাম—তাকে কাছে পাওয়ার উন্মাদ কামনায়। সে তা' জানতো, বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করতো। কিন্তু আজ আমার উদ্দেশ্য আলাদা। বাধা দিল না সে। চুপ করে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল দু'চোখ পাকিয়ে। বলল, বল—কী চাও তুমি?

: সত্য জানতে চাই।

: মানে—একটা গোলমাল করতে চাও।

: তবে বল—সত্যি কথা বললে খুশি হতে পারবো না আমি……

: না, কিছু বলবো না আমি।

: তুমি যে বললে—গোলমাল করতে চাই—

: ও হ্যাঁ, আমার কয়েকটি কথা বলবার ছিল……যাক্, এবার ছেড়ে দাও আমায়।

সে তার হাতখানি ছাড়িয়ে নিতে চাইল না, নড়ল না এক পা-ও। এই অবজ্ঞামাখা আত্ম-সমর্পণের চাইতে সে যদি বিদ্রোহ করতো, তা'হলেই ছিল ভালো। ইচ্ছা হলো—হাত ছেড়ে দিয়ে জোরে চেপে ধরি তাকে। করলামও তাই। তার গায়ের জামাটি আঁট হয়ে গেল দেহের সঙ্গে। হঠাৎ উত্তেজনা অনুভব করলাম। পরক্ষণেই মনে বেজে উঠলো নিরাশার সুর।

প্রশ্ন করলাম, আমার বিরুদ্ধে কী বলার আছে তোমার?

: কিছু না……এবার ছেড়ে দাও, লক্ষীটি।

তাকে আরও জোরে চেপে ধরে বললাম, না না—যেতে দেবো না' তোমায়…সত্যি কথা বলতে হবে এক্ষুনি…সত্যি কথা না বলে এ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না।

আমার দিকে চেয়ে রইল এমিলিয়া। তাকাতে পারলাম না তার দিকে। তার চঞ্চল দৃষ্টি অনুভব করলাম আমার মাথার উপর। অবশেষে সে বলল, বেশ তো, তুমি যখন জানতে চাও—শোন: ভেবে ছিলাম—যেমন চলছে চলুক…কিন্তু, সত্যিই তোমায় আর ভালবাসতে পারি না আমি।……

কোন অপ্রীতিকর কিছু সম্বন্ধে বসে বসে ভাবা যায়, তার কাল্পনিক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু সেই কল্পনা যখন নির্মম সত্যের আকার ধারণ করে তখন বেদনায় ছেয়ে যায় মন, বিশ্বাসই হয় না—এ সত্য! জানি, আমার উপর এমিলিয়ার ভালবাসা নেই। তবু, তার মুখে একথা শুনে বুক কেঁপে উঠলো। একদিন যা ছিল কল্পনা, আজ তা'-ই এমিলিয়ার মুখে উচ্চারিত হয়েছে। এর গুরুত্বই যে স্বতন্ত্র! এ যে কল্পনা নয়—অবাঞ্ছিত সত্য।

স্নানের আগে গায়ে জলের ছিটে লাগলে স্নানার্থী যেমন চমকে উঠে, ঠিক তেমনি চমকে উঠলাম। প্রকৃতিস্থ হয়ে যথাসম্ভব ধীর কণ্ঠে বললাম, এসো—বসো…বল, কেন ভালবাস না আমায়?

সেখানে বসেই বিরক্তিভরে এমিলিয়া জবাব দিল, কী আর বলবো…তোমায় ভালবাসি না আমি……আর কিছু বলবার নেই।

যুক্তিপরায়ণ হবার চেষ্টা করলাম প্রাণপণে। কিন্তু সীমাহীন অব্যক্ত বেদনা সর্বাঙ্গে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল। মুখে ম্লান হাসি টেনে

এনে বললাম, অস্বীকার করবে না নিশ্চয়—কারণটা আমায় জানানো দরকার ·····একটি চাকরকেও কাজ থেকে বরখাস্ত করার আগে কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়।

: আমি তোমায় ভালবাসি না আর······এছাড়া আর কিছু বলবার নেই আমার।

: কিন্তু······তুমি তো আমায় ভালবাসতে—

: হ্যাঁ,······কিন্তু এখন আর ভালবাসি না······সব ফুরিয়ে গেছে এখন।

: কেন? কোন কারণ আছে নিশ্চয়।

: হয়তো আছে······কিন্তু কী কারণ জানি না······শুধু জানি—তোমায় ভালবাসি না আমি।

: না না—বার বার ও-কথাটি বলো না—অমন করে বলো না!

: তুমি নিজেই তো বলাচ্ছ······বিশ্বাস করছ না, তাই বার বার বলতে হচ্ছে।

: এখন আর সন্দেহ নেই আমার।

দু'জনেই নীরব। একটি সিগারেট ধরালো এমিলিয়া। মাথাটি হাতের উপর রেখে চুপ করে বসে রইলাম।

একটু পরে বললাম, যদি তোমায় বলি—আমায় ভাল না বাসার আসল কারণটা কী—

: কিন্তু আমি তো নিজেই তা' জানি না।

: যদি আমিই তোমায় বলে দিই—সত্যি কথা বলবে?

: বেশ···বল তবে—বলেই ফেল না শুনি।

অবাক হয়ে গেলাম তার কণ্ঠস্বরে। নিজেকে সংযত করে বললাম, কারণ আমার চিত্রনাট্যটি টাইপ করছিল যে মেয়েটি—তাকে আমি চুমো

খেয়েছিলাম·····শুধু একটি চুমো—সেই প্রথম ও শেষ·····এবার সত্যি করে বল তো—সেই চুমোটিই কি আমাদের মধ্যে এ ব্যবধান সৃষ্টি করেনি ?

বিস্ময় ও অস্বীকৃতির চিহ্ন ফুটে উঠলো এমিলিয়ার মুখে। না, সত্য নয় আমার অনুমান! কী যেন মনে পড়লো তার। মুখের ভাব বদলে ধীরে ধীরে বলল, আচ্ছা, যদি তাই হয়—কী হবে জেনে ?

বুঝলাম, তুচ্ছ একটিই চুম্বনই তার অকৃত্রিম ভালবাসা হারাবার কারণ নয়, আরো গুরুতর কারণ রয়েছে। আমার উপর এখনও তার কিছুটা শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে, তাই—বলতে পারছে না আসল কথাটি। নিষ্ঠুর নয় এমিলিয়া। কাউকে ব্যথা দিতে চায় না সে। আমি ব্যথা পাবো বলেই সে বলছে না—সত্য প্রকাশ করছে না।

সহজ স্বরে বললাম, না সত্যি কথা বলছ না তুমি·····আর কোন কারণ আছে।

: জানি না, কী বলতে চাও তুমি।

: ভাল করেই জান।

: বিশ্বাস কর—জানি না।

: আমি বলছি—জান তুমি।

মা যেমন অশান্ত শিশুকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো এমিলিয়া।

: এত সব জানতে চাও কেন ?···আচ্ছা লোক তো তুমি···তোমার স্বভাব—সব কিছুতেই মাথা ঘামানো···তা'তে তোমার কী ?

: আমি সত্য আবিষ্কার করতে চাই·· ···তা'ছাড়া, আসল কথাটি না জানলে—কত কী কল্পনা করবো···হয়তো ভাববো বিশ্রী কত কিছু।

আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে চাইলো সে।

বলল, তোমার কী হয়েছে···তোমার বিবেক বলে কিছু আছে—না, নেই ?

: আছে বৈ কি—নিশ্চয় আছে ।

: তবে এ ব্যাপারে নিশ্চয় মাথা ঘামাচ্ছ কেন আবার ?

: তুমি তো জান—কখনও কখনও নিজের বিবেকও নিজেকে ছলনা করে।

: তোমার বিবেক তোমাকে ছলনা করবে না, নিশ্চয় ?

শ্লেষের সঙ্গে বলল এমিলিয়া।

তার ঔদাসীন্যে যতটা ব্যথা পাইনি তার চেয়ে বেশি আঘাত পেলাম এ কথায়।

এমিলিয়া এবার বলল, দেখ, এবার আমি যাবো···আর কিছু বলার নেই তো তোমার ?

: না···সত্য কথা না বলে যেতে পারবে না।

: বলেছি তো—তোমায় ভালবাসি না।

কী গভীর প্রতিক্রিয়াই না সুরু হলো এ তিনটি শব্দে ! মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এমিলিয়াকে মিনতি করলাম, তোমায় তো কতবার বলেছি—ওকথাটি আমায় বলো না···আমি তা'তে ব্যথা পাই······

: তুমিই তো বাধ্য করাচ্ছ আমায়······আমারও ভালো লাগে না ও-কথা বলতে।

: তবে কেন তুমি আমায় বিশ্বাস করাতে চাও—সেই চুম্বনের জন্যই আমায় ভালবাস না আর ?···সে তো শুধু একটি চুমো ছাড়া আর কিছু নয়···ঐ মেয়েটির সঙ্গে সেদিনের পর থেকে আর দেখা হয়নি··

…তুমি তো জান, বোঝ সবই…না—না, অন্য কোন কারণ আছে, নিশ্চয় আছে—যার ফলে তোমার মনোভাব বদলে গেছে।

: স্বীকার করতে হ'বে—তুমি বুদ্ধিমানই বটে!

: মানে?

: বলছি না—তুমি বুদ্ধিমান…বললাম, বুদ্ধি ছিল তোমার।

ইচ্ছা হ'লো বলি—এর মানে, আগে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা ছিল ভালো…পরে খারাপ হ'য়ে গেছে—ফলে, তুমি ভালবাস না আমায়। কিন্তু বললাম: হয়তো তা'ই।

তারপর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হ'য়ে বললাম, ভেবেছ কী—তোমার সঙ্গে খোস-গল্প করতে এসেছি এখানে?

শার্দূল-বিক্রমে এমিলিয়ার ঘাড় ধরে মাটিতে ফেলে গর্জে উঠলাম: বল…এক্ষুনি বল—আসল কারণ কী?

আমার প্রিয়তমা এমিলিয়ার দেহটি মাটিতে পড়ে গেল, সে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো, লাল হয়ে গেল তার মুখ।

জোরে তার গলা টিপে ধরে বললাম, শেষ বারের মতো বল—বল…

এবার আরো জোরে টিপতে লাগলাম। খুন—খুন করে ফেলবো তাকে! চিরদিনের জন্য শত্রু করে রাখার চেয়ে খুন করে ফেলাই ভালো।

আমার পেটে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে নিজেকে একটু ছাড়িয়ে নিয়ে এমিলিয়া বলল, না না না, তোমায় ভালবাসি না আমি…

এ যেন প্রবলতর শত্রুর নির্মমতম আঘাত!

খুনের নেশা কেটে গেল, শিথিল হলো মুষ্টি।

নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিল এমিলিয়া, ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিল আমায়। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আমি তোমায় ঘৃণা করি…

তাই ভালবাসি না আর…তোমার স্পর্শে বিরক্তি আসে…এই হ'লো খাঁটি কথা…তোমায় ভালো লাগে না আমার।

দাঁড়িয়েই ছিলাম। টেবিলের উপর থেকে 'অ্যাস্-ট্রে'টি নেবার জন্য হাত বাড়ালাম। এমিলিয়া বুঝলো—আমি তাকে খুন করতে যাচ্ছি। আর্তনাদ করে দু'বাহু দিয়ে মুখ ঢাকলো সে।

বিধাতা যেন সদয় হলেন আমার উপর। জানি না, কেমন করে সংযত করলাম নিজেকে।

'অ্যাস্-ট্রে'টি টেবিলের উপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম নীরবে।

নবম অধ্যায়

বেশি লেখাপড়া করেনি এমিলিয়া। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কিছুদিন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েছিল, তারপর পড়া ছেড়ে দিয়ে টাইপ ও শর্ট-হ্যাণ্ড্ শেখে। মাত্র ষোল বছর বয়সেই কোন ব্যবহারজীবের দপ্তরে সে কাজ আরম্ভ করে। তবে সদ্বংশে তার জন্ম। একদিন সঙ্গতিপন্ন ছিল তাদের পরিবার। কিন্তু তার পিতামহের আমলে নানা কারণে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তার বাবা অর্থ-দপ্তরে সামান্য বেতনে কাজ করতেন। দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের মধ্যেই বড় হয়েছে এমিলিয়া। শ্রমজীবীদের চেয়ে উঁচু নয় তার শিক্ষা ও চিন্তাধারার মান। সাধারণ জ্ঞানই তার একমাত্র সম্বল। এ জ্ঞানটুকুও আবার এত স্থূল যে সময় সময় মনে হয়—তার কোন বুদ্ধি নেই, কিংবা সে সংকীর্ণ-চিত্ত। তবু, এরই উপর নির্ভর করে কখনও কখনও সে এমন আশ্চর্য সিদ্ধান্ত করতে পারতো যে তা'তে অবাক হয়ে

যেতাম। এটাও শ্রমজীবীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা সুগভীর, সংস্কার ও দেশাচারের প্রভাব-মুক্ত নয় তাদের মন। কোন বিষয় সম্বন্ধে একটু ভেবে সত্যেরই মতো অভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ করতে পারতো এমিলিয়া। কিন্তু নিজে তা' বুঝতে পারতো না, তাই আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ পেতো না। তার সারল্য ও অজ্ঞতা থেকেই বোঝা যেতো—সে যা' বলেছে তার অন্যথা হ'তে পারে না কিছুতেই।......

তাই যেদিন এমিলিয়া ঘোষণা করলো: আমি ভালবাসি না তোমায়, ঘৃণা করি—সেদিনই আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে তার উক্তির মধ্যে মিথ্যা নেই এতটুকুও। মিথ্যা হতে পারে না তার কথা। তার চরিত্র আমি জানি,—এ যেন তার অন্তরের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা না-বলা-বাণী। এই স্বতঃস্ফূর্ত স্পষ্টোক্তি অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। মূর্খের মুখে নীতিকথা শুনলে মন সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। তবু লক্ষ্য করলাম—সে যেদিন আমায় তার প্রথম প্রেম জানিয়েছিল, সেদিন যেমন অকপটে বলেছিল, 'আমি তোমায় ভালবাসি'—আজও ঠিক তেমনি সরলভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছে—'আমি তোমায় ঘৃণা করি'।

ঘরের ভিতর পায়চারি করতে লাগলাম। হাত দু'টো থরথর কাঁপতে লাগলো, ঝাপসা হয়ে এলো দৃষ্টি, তার কথাগুলি কাঁটার মতো অন্তর বিদ্ধ করতে লাগলো। আমি যেন বোধশক্তি হারিয়ে ফেললাম।...শুধু তার ভালবাসা হারাইনি, কেন জানি না—তার ঘৃণার পাত্রও হয়েছি! ভাবলাম—এ অন্যায়, আমার উপর ঘোরতর অবিচার করছে সে।... না, এতে অন্যায় কী আছে? এর কোন অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে। এমিলিয়ার কথায় নিজের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেল। বিত্তহীন

হ'লেও নিজের উপর শ্রদ্ধা ছিল এতদিন। জীবনে আজ প্রথম অনুভব করলাম—এতদিন শুধু মিথ্যা তোষামোদ করে এসেছি নিজেকে।

বাথরুমে গিয়ে কলের নীচে মাথাটি রাখলাম। মস্তিষ্ক যেন আগুনের মতো লাল হয়ে গেছে, দাবানল জ্বলে উঠেছে মস্তিষ্কের ভিতর। হাত মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে শোবার ঘরে গেলাম। টেবিলের উপর চোখ পড়তেই বিদ্রোহী হয়ে উঠলো মন। এখানে বসে রোজকার মতো এক সঙ্গে খেতে পারবো না দু'জনে। এ-ঘরেই যে ধ্বনিত হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর শব্দগুলি—যা শুনে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছি আমি।······

এমিলিয়া এসে দরজা খুলে দেখলো। তার মুখখানি প্রশান্ত—যেন কিছুই হয়নি। তার দিকে না তাকিয়েই বললাম, আজ বিকেলে এখানে খাবো না···ঝি-কে বলে দাও—আমরা বাইরে যাচ্ছি···তৈরী হয়ে নাও শিগগির।

অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করল, কেন?···রান্না-বান্না হয়ে গেছে—জিনিস গুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে যে তা'হলে।······

ঃ আঃ—থাম তো······নষ্ট হয়, হোক···তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে এসো···বাইরে যাবো।

ফিরে চাইলাম না এমিলিয়ার দিকে। শুনলাম তার কণ্ঠস্বর ঃ কী যে কর তুমি!

আবার দরজা বন্ধ করে দিল এমিলিয়া······

একটু পরেই বেরোলাম। গাড়িটি বাইরেই ছিল, নীরবে সেদিকে অগ্রসর হতে লাগলাম দু'জনে।

গাড়িতে উঠলাম, পাশে বসলো এমিলিয়া। হাত বাড়িয়ে সশব্দে দরজাটি বেঁধে দিলাম। আগে দরজা বন্ধ করার সময় এমিলিয়ার হাঁটুর

সঙ্গে নিজের হাঁটু লাগাতাম, কিংবা ঘাড় ফিরিয়ে তার নরম ঠোঁটে চুমো খেতাম। আজ ইচ্ছে করেই স্পর্শ করলাম না তাকে।

গাড়ি চালিয়ে দিলাম। এমিলিয়া বলল, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

চিন্তা না করেই বললাম, ভায়া আপ্পিয়া।

: এখনও যে সেখানে যাবার সময় হয়নি···বড্ড শীত···যায়গাটি এখন জনশূন্য।

: তা'তে কী হয়েছে? সেখানেই যাবো আমরা।

প্রতিবাদ করলো না সে। আপ্পিয়ার পথে গাড়ি চালাতে লাগলাম। নগরীর মাঝপথ ফেলে, শেওলা-ঢাকা প্রাচীন প্রাচীর, বাগান, সব্জি-খেত ও ছায়া-ঘেরা বাগান-বাড়ি পেরিয়ে প্রবেশ-পথে পৌছলাম। ভিতরে দু'টি প্রদীপ জ্বলছে মিটমিট করে। ঠিকই বলেছে এমিলিয়া—এখানে আসার সময় হয়নি এখনও, কেউ নেই এখানে।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখলাম—টেবিল খালি, বেয়ারারা অলসভাবে বসে গল্প-গুজব করছে। খদ্দের বলতে শুধু আমরাই। নির্জন কক্ষে স্বধু বেয়ারারা ছাড়া আর কেউ নেই।

এখানে বোঝাপড়া হ'তে পারে না আমাদের। মনে পড়লো—দু'বছর আগে যখন আমাদের প্রেম ছিল সুনিবিড়, তখন এই রেস্তোরাঁয় খেতাম আমরা। এত রেস্তোরাঁ থাকতে এখানে কেন এলাম আজ?

"মেন্যু" নিয়ে এলো বেয়ারা। ডিনারের অর্ডার দিলাম। তালিকা পড়ে শোনালাম এমিলিয়াকে। সে মাথা নিচু করে সংক্ষেপে উত্তর দিতে লাগলো—হ্যাঁ···না···বেশ। এমিলিয়া মদ খাবে না জেনেও এক বোতল দামী মদ চাইলাম। বললাম, আমিই খাবো। আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসলো বেয়ারাটা।

খাবার এলো টেবিলে, খেতে লাগলাম দু'জনে।

এতদিন সবই হ'তো সহজভাবে, ছোটখাটো ব্যাপারে খেয়ালই ছিল না, একটা কিছু করে ফেলার পর চৈতন্য হতো আমার। আজ এমিলিয়ার প্রেমের মোহ কেটে গেছে, আমি যেন সচেতন হয়েছি প্রতিটি কাজে। নুনের শিশিটা দিলাম এমিলিয়াকে, গেলাসটি ঠেলে দিয়ে তার দিকে চাইলাম একবার। আমার প্রতিটি ভঙ্গীতে যেন লেগে রয়েছে এক বেদনাময় অর্থহীন অকারণ অসমর্থ চেতনা। স্তব্ধ অবশ হয়ে পড়লাম। আমি যেন শৃঙ্খলিত হয়েছি। বার বার ভাবতে লাগলাম, ভুল করছি না তো? না না, সত্যিই আত্মবিশ্বাস হারিয়েছি আমি। অপরিচিতের হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার আশা করা যায়, কিন্তু এমিলিয়ার বেলায় সে এক পুরনো অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। কোন আশা নেই এক্ষেত্রে। দু'জনেই নীরব, মাঝে মাঝে দু'একটি ভাঙা ভাঙা কথা: রুটি চাই তোমার···মাংস···মদ···

আমাদের মিলিত জীবনে অমর হয়ে রয়েছে সেই সন্ধ্যা।

যা বলতে চেয়েছিলাম, বলা হলো না। অসহ্য নীরবতায় চাপা পড়ে গেল সব। ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না তখনকার মনের ভাবটা। বিরুদ্ধ মৌনতা বলা যায় তাকে: দু'জনের মধ্যে কোন বৈরীভাব নেই—অন্ততঃ আমার দিক থেকে তো নেই—রয়েছে শুধু অক্ষমতা। কত কিছু বলতে চাই, কিন্তু পারছি না। ভেবেই পাচ্ছি না কী বলবো?

মনের আবেগ রুদ্ধ করে নীরব রইলাম তাই। কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। তবু মনে হলো—চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়। মৌনতা ভাঙলেই তো এক তিক্ত আলোচনার মধ্যে নিজেকে টেনে আনতে হবে।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, চুপ করে আছ কেন, এমিলিয়া ?

: কী বলবো আর···কিছুই তো বলার নেই।

শান্ত স্বাভাবিক তার কণ্ঠস্বর। সত্যের মতো স্পষ্ট তার উক্তি।

বললাম, কেন, একটু আগে যা বলেছ—তা'ই' তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা যেতে পারে।

: ভুলে যাও ওকথা···মনে কর কিছু বলিনি······

আশায় দীপ্ত হলো অন্তর। বললাম, ভুলবো কেন?···হ্যাঁ ভুলবো—যদি জানি, তা' সত্য নয়—রাগের মাথায় তুমি ও-কথাটি বলেছ······

এবার কিছুই বলল না এমিলিয়া। আবার আশা—হয়তো তার কথাই ঠিক। তার উপর বল প্রয়োগ করেছিলাম, তাই সে ঘৃণা করেছিল আমায়।

সতর্কতার সঙ্গে বললাম, বল—তবে, আজ যে ভয়ঙ্কর উক্তিটি করেছ তা' সত্য নয়···শুধু বল—তখন সেই মুহূর্তে তোমার মনে হয়েছিল—আমায় ঘৃণা কর তুমি।

আমার দিকে চাইলো সে। কিন্তু একী! ভুল করিনি তো? ভালো করে দেখলাম। না, সন্দেহ নেই এতটুকু। সত্যিই তার দু'টি চোখ অশ্রু-সজল।

উৎসাহিত হয়ে এমিলিয়ার হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিলাম। বললাম, বল এমিলিয়া, বল প্রিয়তমে—সত্যি নয়—সত্যি নয় তোমার কথা······

এক টানে হাত সরিয়ে নিল সে। বলল, সত্যি।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম তার উত্তরে। সে জানে—একটি মিথ্যে কথা বললেই সব গোলমাল চুকে যায়। তাই সে যেন ভাবলো—মিথ্যে

বলবে, কিন্তু পরক্ষণেই মন স্থির করে বললো এ কথাটি। নতুন করে ব্যথা পেলাম আবার, তীব্রতর হয়ে উঠলো মনের বেদনা। ঘাড় নিচু করে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বললাম, কিন্তু তুমি তো জান—এমন অনেক কথা আছে যা অকারণে কাউকে বলা চলে না···কাউকেই না—স্বামীকে তো নয়ই।

নীরবে শঙ্কাভরে একবার মুখ তুলে চাইলো এমিলিয়া। হয়তো রাগে বিকৃত হয়েছিল আমার মুখ। ধীরে ধীরে বলল, তুমি জানতে চেয়েছিলে, তাই বলেছিলাম।

: কিন্তু—সব পরিষ্কার করে বলতে হবে।

: আর কেমন করে বলবো?

: বলতে হবে—কেন তুমি আমায় ঘৃণা কর।

: না, বলবো না—প্রাণ গেলেও না।

তার কণ্ঠস্বর বিস্ময় জাগালো আমার মনে। কিন্তু সে-ভাব স্থায়ী হলো না। রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম হঠাৎ। খপ্ করে তার হাত ধরে বললাম, বল···বল···কেন ঘৃণা কর আমায়?

···বল, সত্যি করে বল!

: না, বলবো না।

: বল···নইলে মারবো।

রাগে তার আঙ্গুলে চাপ দিলাম জোরে।

: উঃ।—বেদনায় মুখখানি কুঞ্চিত করলো এমিলিয়া। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, থাম—থাম—ছিঃ···আরও ব্যথা দিতে চাও আমায়?

দম আটকে যাচ্ছিল এমিলিয়ার কথা শুনে। আমি যেন এর আগেও তাকে ব্যথা দিয়েছি। তার হাত ছাড়লাম না তবু।

এমিলিয়া বলল, ছিঃ—ছিঃ, লজ্জা করে না তোমার?…বেয়ারারা দেখছে যে!

: বল, কেন ঘৃণা কর?

: বোকামি করো না আর…ছেড়ে দাও আমায়…ছাড় বলছি!

: উঃ—

আঙ্গুল ঘুরিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল এমিলিয়া। একটি গেলাস মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। গেলাস ভাঙার শব্দ হলো।

এক লাফে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে এমিলিয়া বলল, আমি গাড়িতে যাচ্ছি…তুমি ততক্ষণে "বিলটা" মিটিয়ে দাও।

এমিলিয়া বেরিয়ে গেল। নিশ্চলভাবে বসে রইলাম আমি।

বেয়ারারা বসে বসে আমাদের লক্ষ্য করেছে সারাক্ষণ। তাই লজ্জার চেয়ে অপমানই বোধ করলাম বেশি। এমন হয়নি এর আগে। এক অপ্রীতিকর প্রহেলিকার মতো কানের কাছে বাজতে লাগলো সেই শব্দটি—"আরও"—।

আর কবে ব্যথা দিলাম তাকে? বিলটি মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁর বাইরে এলাম।

ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। মাথার উপরে আকাশ ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা। দেখলাম, গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে এমিলিয়া। গাড়ির দরজা তালা বন্ধ। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কম্পিত কণ্ঠে বললাম, ঈস্ ভুলেই গিয়েছিলাম—গাড়ির দরজা বন্ধ…কিছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি।

সে শান্তভাবে বলল, না সামান্য বৃষ্টি বই তো নয়! কী হয়েছে তা'তে?

দরজা খুলে গাড়িতে উঠলাম, পাশে এসে বসলো এমিলিয়া। গাড়ি চালাতে লাগলাম। অতর্কিত উল্লাসের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, এবার কোথায় যেতে চাও ?

ঃ জানি না···তোমার যেখানে খুশি।

স্ফূর্তির সঙ্গে গাড়ি চালাতে লাগলাম। হয়তো—সমস্ত ঘটনাটিকে কৌতুক হিসাবে উড়িয়ে দেওয়া যাবে, এমিলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কের সমস্যা মিটবে।

একটু রসিকতা করে বললাম, বেশ তবে চল······যেখানে নিয়ে যায় নিয়তি···দেখা যাক কী হয়······

ভয়ঙ্কর বিশ্রী লাগলো একথা বলে। এ যেন খোঁড়ার নাচের মতো হাস্যকর। কিন্তু এমিলিয়া নীরব। বৃষ্টির ভিতর দিয়ে গাড়ি চলেছে। গাড়ির সামনের আলোয় সাইপ্রেসের সারি, ভগ্ন পাষাণ-স্তূপ, শাদা শাদা মার্বেলের মূর্তি ও প্রশস্ত রাজপথ চোখে পড়ছে।

কিছুদূর এগিয়ে এসে কৃত্রিম উল্লাসভরে বললাম, চল এবার আমরা ভুলে যাই নিজেদের···মনে কর—আমরা দু'টি তরুণ ছাত্র-ছাত্রী······ দু'জনে খুঁজে বেড়াচ্ছি একটি নিভৃত কোণ—যেখানে কারো দৃষ্টি পৌছবে না, নিশ্চিন্ত আনন্দে রচনা করতে পারবো জীবনের প্রথম নিভৃত মিলন-কুঞ্জ······

তবু কিছু বলল না এমিলিয়া। সাহস পেয়ে গাড়ি থামালাম। বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। অনিশ্চিত কণ্ঠে আবার বললাম, মনে কর—আমি মেরিও আর তুমি মেরিয়া···অবশেষে আমরা খুঁজে পেয়েছি বৃষ্টি-ভেজা একটি নির্জন স্থান···কিন্তু আমরা তো রয়েছি গাড়িতে··· এসো, একটু আদর করে দাও······

বাহু দিয়ে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে চুমো খেতে চাইলাম। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো এমিলিয়া। আমায় ঠেলে দিয়ে বলল, ছিঃ—তুমি কি পাগল হয়েছ, না নেশা করেছ?

: না, নেশা করিনি—পাগলও হইনি···একটি চুমো খেতে দাও। আবেগের স্বরে সে বলল, ও কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না আমি···যখন বলি—তোমায় ঘৃণা করি, তখন অবাক হয়ে যাও···অথচ যখন এমন ব্যবহার কর—এত কিছু হ'বার পরও······

: কিন্তু আমি যে তোমায় ভালবাসি!

: আমি ভালবাসি না তোমায়।

ধিক্কার এলো মনে। তবু বললাম, একটি চুমো খাও লক্ষ্মীটি··· খাও···ভালবেসো না, তবু···নইলে ছাড়বো না।

ঝাঁপিয়ে পড়লাম এমিলিয়ার গায়ের উপর। সে দরজা খুলে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে গেল নীরবে। বাইরে বৃষ্টির বেগ কমেনি। রাস্তার উপর দিয়ে ছুটলো সে। আমিও নেমে এলাম গাড়ি থেকে। রাস্তায় পা দিতেই পায়ের গোড়ালি জলে ডুবে গেল। উত্তেজিত ভাবে ডাকলাম: এমিলিয়া···এমিলিয়া···ফিরে এসো···কোন ভয় নেই··· তোমায় স্পর্শ করবো না আর······

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না কিছুই। অদূরে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তুমি এসো না···ওখানেই থাক নইলে কিন্তু হেঁটেই রোম-এ চলে যাবো আমি।

কম্পিত কণ্ঠে বললাম, বেশ, তুমি যা' বল তা'ই হবে।

বৃষ্টিতে জামা ভিজে গেল, গা বেয়ে জল পড়তে লাগলো টপ টপ করে। গাড়ির আলোয় বেশিদূর দেখা যাচ্ছিল না। চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম না এমিলিয়াকে। হতাশ হয়ে ডাকলাম: এমিলিয়া···এমিলিয়া···

কান্না এলো আমার।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে এমিলিয়া দাঁড়ালো আমার সামনে। বলল, দিব্যি করে বল—আমায় ছোঁবে না?

: হ্যাঁ, বলছি—ছোঁব না।

গাড়ির ভিতর উঠে বসলো এমিলিয়া। বলল, এ আবার কোন্ ধরণের রসিকতা...একেবারে ভিজে কাক হয়ে গেছি...ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে মাথা বেয়ে...কাল সকালেই চুল 'ড্রেস' করাতে হবে।

গাড়ি চালাতে লাগলাম আবার। দু'একবার হাঁচলো এমিলিয়া—যেন দেখালো—আমারই জন্য সর্দি লেগেছে তার।

গাড়ি চালাতে চালাতে স্বপ্ন দেখলাম—এক বিশ্রী স্বপ্ন :

আমি রিকার্ডো, আমার স্ত্রীর নাম এমিলিয়া...আমি তাকে ভালবাসি...সে আমায় ভালবাসে না—ঘৃণা করে!...

দশম অধ্যায়

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো। অবসন্ন নিস্তেজ হয়ে পড়েছি, সারা গায়ে অসহ্য বেদনা। আগের দিনের ঘটনায় ও ভবিষ্যতের চিন্তায় ঘৃণা জেগেছে মনে। এমিলিয়া তখনও ঘুমোচ্ছে। আধো অন্ধকারে অলসভাবে শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। ঘুমে ভুলে-যাওয়া বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলাম ধীরে ধীরে। ঠিক করতে হবে—'ওডিসি'র চিত্র-সম্পাদনার ভার নেবো কিনা; জানতে হবে—এমিলিয়া কেন ঘৃণা করে আমায়; আবিষ্কার করতে হবে—তার ভালবাসা ফিরে পাওয়ার উপায়।

চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—আমার জীবনের এই

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এমনি করে সমাধান করবার চেষ্টা করা কি শুধু শক্তির অপচয় নয়? বুঝলাম—এ সব প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কল্পনা বাস্তবের সুদৃঢ় ভিত্তি ছেড়ে উচ্চাশার শূন্য মার্গে উড়ে গেল।

কল্পনা-নয়নে দেখলাম:

আমি 'ওডিসি'র চিত্র-নাট্য রচনা করছি…এমিলিয়ার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই…আমার প্রতি তার অবজ্ঞা শিশু-সুলভ ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছু নয়…সত্যের লেশমাত্রও নেই তা'তে… তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে আমার……

আমি যেন একটা প্রীতিকর উপসংহার কামনা করছি। কিন্তু সেই উপসংহার ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে যে বিরাট শূন্যতা রয়েছে তা' কিছুতেই পূরণ করতে পারছি না। আমি চাই—আমারই অনুকূলে সমস্যাটা সমাধান করি, কিন্তু জানি না—কেমন করে?

একটু তন্দ্রা এলো। তারপর কখন জানি না গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখলাম—এমিলিয়া সেজেগুজে বসে আছে আমার পায়ের কাছে। খড়খড়িগুলো বন্ধ, তাই ঘরটি তখনও আব্‌ছা অন্ধকার। টেবিলের উপর একটি ল্যাম্প জ্বলছে। টেরই পাইনি—এমিলিয়া কখন সে ল্যাম্পটি চড়িয়ে দিয়ে এসে বসেছে আমার কাছে।

মুগ্ধ হয়ে গেলাম—তাকে এই চির-পরিচিত বেশে দেখে। মনে পড়লো—হারানো অতীতের মধুময় দিনের স্মৃতি। রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, বল—বল এমিলিয়া—তুমি ভালবাস আমায়……

আমার প্রশ্নের জবাব দিল না সে। একটু পরে বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বলতে চাইলাম—তোমার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না আমি···আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও। কিন্তু তার বদলে প্রশ্ন করলাম, কী কথা?

ঃ আমাদেরই সম্বন্ধে—

ঃ কিন্তু আর তো কিছু বলার নেই···তুমি আমায় ভালবাস না··· ঘৃণা কর।

শান্ত সহজভাবে সে বলল ঃ সে-কথা নয়···বলছিলাম—আমি আজ মার কাছে যাচ্ছি। মাকে টেলিফোন করার আগে তোমায় বলতে এলাম।

অন্যায় ও অপ্রত্যাশিত না হলেও আশ্চর্য হলাম তার এ ঘোষণায়। এ ধারণা তো কখনও মনে জাগেনি যে এমিলিয়া আমায় ছেড়ে যাবে। আমার প্রতি তার নিষ্ঠুরতা চরম সীমায় এসে পৌছেছে, তবু ঠিক বুঝতে পারলাম না তার কথার অর্থ।

ঃ বলছ—আমায় ছেড়ে যাবে তুমি?

ঃ হ্যাঁ।

মুহূর্তেক নীরব থেকে জানালার খড়খড়ি খুলে দেবার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

পেছন ফিরে বললাম, না—অমন করে যেতে পারবে না···আমি চাই না—তুমি যাও।

ঃ ছেলেমানুষের মতো কথা বলো না···বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোন উপায় নেই···আমাদের মধ্যে আর কিছু বাকী নেই—অন্ততঃ আমার তো নেই······এতে দু'জনেরই মঙ্গল হবে······

ঠিক মনে নেই, তার এ উক্তির পর কী করেছিলাম। তবে যতদূর মনে পড়ে—প্রলাপ বকেছিলাম, হাত-পা ছুঁড়েছিলাম, অঙ্গভঙ্গী করেছিলাম সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায়, হয়তো—ঘরের ভিতরে পায়চারি

করেছিলাম, এমিলিয়াকে সেধেছিলাম: যেয়ো না—যেয়ো না, জানিয়েছিলাম আমার অবস্থার কথা, কাউকে উদ্দেশ্য না করেই আপন মনে কত কী বলেছিলাম। ...

ভাবতেই পারছিলাম না—সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাস করতে হবে এ ঘরে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল......

বিচ্ছেদ ও নিঃসঙ্গতার চিন্তায় বিদ্রোহী হয়ে উঠলো আমার সকল সত্তা। বিশ্বাস হলো না কিছুতেই। আশঙ্কা ও ভয়ের মেঘ আমায় ঘিরে রয়েছে, তারই ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে এমিলিয়ার মুখখানি। নিশ্চলভাবে বসে আছে সে।

সে বলল, অবিবেচক হয়ো না রিকার্ডো......এই হ'লো আমাদের একমাত্র পথ।

তার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, কিন্তু আমি যে তোমায় যেতে দিতে চাই না—যেতে দেবো না তোমায়।

: কেন দেবে না? অবুঝ হয়ো না।

যা' বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারিনি যেন। অতি কষ্টে আত্মদমন করে বিছানার উপর এসে বসলাম আবার।

বললাম, কখন যেতে চাও?

: আজই।

আমার দিকে দৃক্‌পাত না করেই হন্ হন্ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এমিলিয়া।

হাতের তালুর উপর মাথাটি রেখে বসে রইলাম। কখনও যে ভাবিনি—সে এমন করবে, একথা বলবে।

এ যেন আমারই ভুল! ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলাম। তীব্র উত্তেজনায় মনে হলো—ঘরটির রূপ বদলে গেছে—যেন সঙ্কুচিত হয়েছে

ঘরটি। এমিলিয়া যে-ঘরে বসেছিল এতো সে-ঘরই নয়। এ সে-ই ঘর—যেখানে এমিলিয়া নেই, আর কখনও ফিরে আসবে না, অনির্দিষ্ট কাল ধরে যেখানে আমাকে বাস করতে হবে একা। সবই যেন পরিত্যক্ত, নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ। চোখের সামনে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো ভবিষ্যতের ছবি। ঘামতে লাগলাম। একটি বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো, দু'চোখ বেয়ে নামলো অবিরল অশ্রুধারা।

আর থাকতে পারলাম না সেখানে। উন্মাদের মতো শোবার ঘরে চলে এলাম। আলোয় চোখ ঝলসে গেল। এতক্ষণ বসেছিলাম অস্পষ্ট আলোয়। এই মুক্ত আলোক অসহ্য বোধ হলো।

দেখলাম—মলিন শয্যার উপর বসে টেলিফোন করছে এমিলিয়া। একটি কথা শুনেই বুঝলাম, মার সঙ্গে কথা বলছে। তার মুখের উপর উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বিচলিত দেখাচ্ছে তাকে। অদূরে বসে মুখখানি হাত দিয়ে চেপে ধরে ফোঁপাতে লাগলাম। তখনও রিসিভারটি ছাড়েনি এমিলিয়া। তার মা যেন অনেক কথা বলছেন তার সঙ্গে। ঝাপসা চোখে দেখলাম—প্রকৃতির উপর কালো মেঘের ছায়ার মতো একটি নিরাশ রুষ্ট ভাব ফুটলো এমিলিয়ার মুখের উপর। সে বলল, বেশ...বুঝলাম...আর কখনও ও-কথা বলবো না তোমায়।...কিন্তু আবার কী বললেন তার মা। কথাটা শুনতে পারলো না সে—আর ধৈর্য নেই। বলল, একথা তো আগেই বললে...বুঝলাম সব...আচ্ছা...আচ্ছা...

আবার কী বলতে চাইলেন মা। রিসিভারটি রেখে এবার আমার দিকে চোখ তুলে চাইলো এমিলিয়া। সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। তার হাত ধরে বললাম, যেয়ো না—যেয়ো না, লক্ষ্মীটি আমার—

শিশু, নারী ও কাপুরুষেরা ভাবে—চোখের জলের আবেদন গভীর, চোখের জলে সহজেই মানুষের মন গলানো যায়। মনের দুঃখেই কাঁদছিলাম। কিন্তু চোখের জল ফেলছিলাম কাপুরুষের মতো। আশা ছিল, এমিলিয়াকে বাধা দেবে আমার অশ্রু। আশান্বিত হয়েছিলাম তাই। পরক্ষণেই মনে হলো—এমিলিয়াকে ছলনা করবার জন্যই চোখের জল ফেলেছি। লজ্জিত হ'লাম তাই। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পায়জামার উপর পেণ্টুলন পরলাম, অনিচ্ছার সঙ্গে একটি সিগারেট ধরালাম। চেয়ারে এসে বসলাম তারপর। এমিলিয়া এসে বলল, কোন চিন্তা নেই······ভয়ের কোন কারণ নেই······আমি যাচ্ছি না···যাচ্ছি না।

তার কণ্ঠস্বরে হতাশা, তিক্ততা ও ঔদাসীন্য। বিচলিত ও বিব্রত দেখালো এমিলিয়াকে। সে চোখ নামিয়ে কী যেন ভাবলো। দেখলাম—এমিলিয়ার ঠোঁটের দু'টি কোণ কাঁপছে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে সে।

বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে এমিলিয়া বলল, আমার মা আমায় চান না··· ···তিনি বলেন, আমার ঘরটি ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন···দু'জন ভাড়াটে আগে ছিল, এখন হয়েছে তিনজন···একটি ঘরও খালি নেই···আমি যে সত্যিই যেতে চাই—একথা তিনি বিশ্বাসই করতে চাইছেন না······ কেউ চায় না আমায়···তোমারই সঙ্গে থাকতে বাধ্য হবো আমি······

এ কী নিদারুণ উক্তি! কে যেন ছুরি বসিয়ে দিল আমার বুকে। ঘৃণাভরে বললাম, আমার সঙ্গে অমন করে কথা বলছ কেন? 'বাধ্য' হবে কেন?···কী করেছি আমি তোমার? কেন তুমি অমন ঘৃণা কর আমায়?

এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো এমিলিয়া। দু'হাত দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, তুমিই তো আমায় যেতে দিতে চাওনি। তা' বেশ···আমি থাকছি···তোমার তো খুশিই হওয়া উচিত······না?

অতীতের কথা ভুলে তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, সত্যিই আমি চাই—তুমি এখানেই থাক, কিন্তু বাধ্য হয়ে নয়……বল এমিলিয়া, কী করেছি আমি,—যার জন্য আমার সঙ্গে এমনি করে কথা বলছ ?

এমিলিয়া বলল, তুমি যদি চাও—আমি চলে যাবো…কোথাও ছোট্ট একটি ঘর নেবো……আবার টাইপিষ্ট হবো……বেশি দিন আমায় সাহায্য করতে হবে না তোমার……একটা কাজ পেলেই আর কিছু চাইবো না তোমার কাছে।

বললাম, না না, এমিলিয়া……আমি চাই—তুমি এখানেই থাক… কিন্তু আবার বলছি, বাধ্য হয়ে নয়—বাধ্য হয়ে নয়।

তখনও কাঁদছিল সে। বলল, কিন্তু—তুমি তো বাধ্য করছ না, বাধ্য করছে আমার জীবন।

আবার বুকে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। ইচ্ছা হলো—প্রশ্ন করি :— বল, কী করেছি আমি…কেন ঘৃণা কর আমায় ? কিন্তু এখন প্রশ্নের সময় নয়। বললাম, আর আলোচনায় কাজ নেই, তা'তে শুধু দুঃখই বাড়বে……এখন তোমার কাছ থেকে আর কিছু জানতে চাই না আমি …তবে একটি কথা : আমি 'ওডিসি' চিত্র-নাট্যের ভার নিয়েছি…… কিন্তু বাত্তিসতা বলেছেন—নেপল্‌স্‌ উপসাগরে গিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি তুলতে হবে……তাই ঠিক হয়েছে—আমরা ক্যাপ্রিতে যাবো…সেখানে তুমি তোমার খুশিমতো নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে পারবে…সমুদ্রে স্নান করতে পারবে, বেড়াতে পারবে…কেউ বাধা দেবে না তোমায়… ঠিকই বলেছেন তোমার মা……ভেবে দেখা উচিত বই কী……এই তিন-চার মাসের মধ্যে তুমি তোমার সংকল্প আমায় জানাতে পারবে ……তার আগে সে-সম্বন্ধে একটি কথাও জিগ্যেস করবো না।

ঘাড় ফিরিয়ে রেখেছিল এমিলিয়া—যেন আমায় দেখতে না পায়। আমার কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে বলল, কখন যাচ্ছি আমরা ?

: খুব শিগগিরই—অর্থাৎ দিন দশেকের মধ্যে—পরিচালক প্যারিস থেকে ফিরে এলেই।

এমিলিয়ার নরম বুকটি তখনো লেগে আছে আমার বুকে। ভাবলাম, একটি চুমো খাবার দুঃসাহস করবো কিনা। আমার আলিঙ্গনে সে রয়েছে নির্বিকার। এ যেন তার নীরব আত্ম-সমর্পণ।

ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল এমিলিয়া, সেখানে কোথায় থাকবো আমরা ? হোটেলে ?

তাকে খুশি করবার জন্য বললাম, হোটেলের চেয়ে ভালো যায়গা পাওয়া গেছে……হোটেলে কি থাকা যায় ?……বাত্তিসতা তাঁর বাগান-বাড়িটি দেবেন……সেখানেই থাকবো আমরা।

সেদিন বাত্তিসতার চিত্রনাট্য লিখতে রাজী হবার পর যেমন হয়েছিল, আজও ঠিক তেমনি মনে হলো—এ পরিকল্পনা মনঃপূত হয়নি এমিলিয়ার।

আমার বাহুবন্ধন মুক্ত করে নিয়ে সে বলল, বাত্তিসতার বাগান-বাড়ি!……তুমি রাজী হয়েছ ?

: ভেবেছিলাম, তুমি খুশি হবে তা'তে।……হোটেলের চেয়ে বাগান-বাড়ি ভাল নয় কি ?

: বল না, তুমি রাজী হয়েছ কিনা।

: হ্যাঁ।

: পরিচালকও সেখানেই থাকবেন ?

: না, রেনগোল্ড হোটেলেই থাকবেন।

: বাত্তিসতা যাবেন ?

: বাত্তিসতা! হ্যাঁ, হয়তো কখনও কখনও……সপ্তাহে একবার কি দু'বার যেতে পারেন—অল্প সময়ের জন্য·· উনি শুধু দেখবেন—কাজটা কেমন এগোচ্ছে।

কোন কথা না বলে পকেট হাতড়ে রুমাল নিয়ে নাক মুছতে লাগলো এমিলিয়া। তার পরনের জামাটি কোমর পর্যন্ত খুলে গেল। এ যেন মৌন ইংগিত। ইচ্ছা হলো—কাছে টেনে নিই তাকে। কিন্তু ঠিক করলাম—আকাঙ্ক্ষা যতই তীব্র হোক না কেন, তাকে স্পর্শ করব না। তার দিকে চেয়ে রইলাম, বুক কাঁপতে লাগলো—যদি চোখাচোখি হয়ে যায়?

যা আশঙ্কা করেছিলাম তা'ই হলো।

নাক মুছে মুখে ম্লান হাসি টেনে এনে সহজ শান্ত স্বরে সে বলল, তুমি দেখছি এখন আর তোমার স্ত্রীর নগ্ন রূপ দেখতে লজ্জা পাও না—অবশ্যি লুকিয়ে লুকিয়ে।

তারপর জামাটি টেনে উপরে তুলে দিয়ে বলল, আমি ক্যাপ্রিতে যাবো—কিন্তু এক শর্তে।

: শর্তের কথা বলো না……এতে কোন শর্ত নেই……আর কোন কথা শুনতে রাজী নই আমি……আমরা যাবো—ব্যস্……কোন অজুহাত শুনবো না……এখন যাও তো……

আমার কণ্ঠস্বরে যেন রাগ প্রকাশ পেলো। তাই হয়তো শঙ্কিত হয়েই সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেল এমিলিয়া।

একাদশ অধ্যায়

ক্যাপ্রি দ্বীপে যাবার দিন সকালে রাস্তায় এসে দেখলাম—আমার ছোট্ট গাড়িটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাত্তিসতার লাল মোটর গাড়ি। বাত্তিসতা আমাদের সঙ্গে যাবেন। আমরা তাঁর বাড়িতে যাচ্ছি—তাঁকে

ছাড়া কি যাওয়া যায়? কে আমাদের অভ্যর্থনা করবে সেখানে? নতুন যায়গা—সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসবেন তিনি।

সবেমাত্র জুন মাসের সুরু। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ফুরফুরে হাওয়া বইছে। বাত্তিসতা রেনগোল্ড-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন অদূরে দাঁড়িয়ে। এগিয়ে এলাম এমিলিয়া ও আমি।

আমাদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানিয়ে বাত্তিসতা বললেন, এবার বলুন তো, ব্যবস্থাটা কেমন করা যায়? আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই বললেন, আমি প্রস্তাব করছি—মিসেস মলটেনি আমার গাড়িতেই যাবেন, আর আপনি রেনগোল্ড-এর সঙ্গে যান……যেতে যেতে চিত্রটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন আপনারা। তারপর মুচকি হেসে গম্ভীর স্বরে বললেন, কেন না—ধরতে গেলে আজ থেকেই কাজ সুরু কিনা……ছ'মাসের মধ্যেই চিত্র-নাট্যটি পেতে চাই আমি……

এমিলিয়ার দিকে তাকালাম। তার মুখে উদ্বেগ ও অবজ্ঞার ভাব। দেখেও দেখলাম না। বাত্তিসতার প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত, তাই একবারটিও ভাবলাম না—এমিলিয়ার অবস্থার সঙ্গে বাত্তিসতার প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক আছে কি না।……

এমিলিয়া বলল, আপনি ঝড়ের বেগে গাড়ি চালান, আমার ভয় করে।

তার হাত ধরে বাত্তিসতা বললেন, আসুন—যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ ভয়ের কারণ নেই……তা'ছাড়া, ভয় কিসের?…… আমার নিজের বুঝি প্রাণের মায়া নেই?

বাত্তিসতা এক রকম টেনে গাড়ির দিকে নিয়ে চললেন তাকে। জিজ্ঞাসু, বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলো এমিলিয়া। একবার

ভাবলাম, তাকে আমার সঙ্গে আসতে বলবো কিনা। কিন্তু বাত্তিসতা যে অসন্তুষ্ট হবেন তা'তে। কিছু বললাম না তাই।

এমিলিয়া মৃদু আপত্তি জানাল আবার: মলটেনির সঙ্গে গেলেই ভালো হ'তো আমার পক্ষে……

রসিকতা করে বাত্তিসতা বললেন, সত্যিই স্বামী বটে আপনার…সারাক্ষণ শুধু স্বামীর সঙ্গে কাটাবেন কেন……আসুন, নইলে কিন্তু রাগ করবো।

বাত্তিসতা গাড়ির দরজা খুললেন, ভিতরে গিয়ে বসলো এমিলিয়া। বাত্তিসতা উঠে বসলেন পাশে। রেনগোল্ড ও আমি আমার গাড়িতে উঠলাম। দু'খানি গাড়ি চললো। একটু পরেই বাত্তিসতার গাড়িটি আমাদের পেছনে ফেলে সবেগে নেমে গেল পাহাড়ের গা বেয়ে, তারপর একটি বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হলো।

বাত্তিসতা বলেছেন—পথে আমরা যেন চিত্রনাট্য সম্বন্ধে আলোচনা করি। কোন দরকার ছিল না ও-কথা বলার। নগরীর সীমা ছাড়িয়ে এলাম। রেনগোল্ড মুখ খুললেন এবার: সেদিন বাত্তিসতার দপ্তরে আপনি ভয় পেয়েছিলেন নিশ্চয়…ভেবেছিলেন—এমন একটি 'অসামান্য' চিত্রে আপনাকে নামানো হচ্ছে……তাই না?

অসামান্য কথাটির উপর একটু জোর দিয়ে মুখ টিপে হাসলেন তিনি।

অন্যমনস্কভাবে বললাম, এখনও ভয় পাচ্ছি।

কর্তৃত্বের সুরে রেনগোল্ড বললেন, কোন ভয় নেই আপনার……আমরা মনস্তত্ত্বমূলক ছবিই তৈরী করব—আপনাকে যেমন বলেছি ঠিক তেমনি……আর, জানেন মিঃ মলটেনি, অন্যান্য চিত্র-নির্মাতারা যেমন ভয় করেন—তেমন ভয় আমি করি না……আমি কী চাই জানেন……

চলচ্চিত্রের দৃশ্যসজ্জার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে আমারই হাতে……নইলে ছবি তুলবোই না……এই আমার সাফ কথা……বুঝলেন ?

: নিশ্চয়।

খুশি হ'লাম তাঁর কথা শুনে। আশা হলো—ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কাজ করতে কোন বেগ পেতে হবে না।……

একটু পরেই রেনগোল্ড বললেন, এবার শুনুন—আমার আইডিয়াটি …গাড়ি চালাতে চালাতে শুনতে পাবেন তো ?

: নিশ্চয় নিশ্চয়…… আপনি বলুন না……আমি শুনছি।

: দেখুন মলটেনি, ক্যাপ্রিতে যেতে রাজী হয়েছি……বহির্দৃশ্যগুলি নেপ্‌লস্‌ উপসাগরেই তুলবো…… কিন্তু সেটা হবে শুধু পটভূমি… বাকীটার জন্য তো রোম-এ থাকতেই হবে…ইউলিসিস নাটকটি কোন নাবিক, সৈনিক বা আবিষ্কারকের কাহিনী নয়—এ নাটক সর্ব লোকের সর্ব কালের……ইউলিসিসের উপকথার আড়ালে রয়েছে এক শ্রেণীর লোকের সত্যিকারের জীবন।

চিন্তা না করেই বললাম, গ্রীক উপকথা মাত্রই মানুষের জীবন-নাট্য—কালাতীত, স্থানাতীত, চিরন্তন।

: সত্যিই তাই…প্রতিটি গ্রীক উপকথাই বলতে গেলে, মানব-জীবনের আদর্শ রূপক…এই প্রাচীন, বিস্মৃতপ্রায় উপকথাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এখন এ-যুগে কী করতে হবে আমাদের ? উপকথাগুলির উপর ভিত্তি করে রচিত গ্রীক সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব না হারিয়ে আধুনিক জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে, সম্পূর্ণ স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিতে যুগোপযোগী করে রূপায়িত করতে হবে—জীবন্ত করে তুলতে হবে……যেমন ধরুন—ও'নীল-এর 'মোর্ণিং বিকাম্‌স্‌ ইলেক্‌ট্রা'…ও'নীল এই সহজ সত্যটি

বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রাচীন উপকথাগুলির আধুনিক ভাষ্য প্রয়োজন···তবে·· ঐ ফিল্মটির কথা আমি ভাবিই না। কেন জানেন? কাহিনীটিকে তিনি একেবারে অবিকৃত রেখেছেন—এ যেন লাইন-টানা খাতায় লেখা—লাইনগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ও'নীলের সমালোচনা করে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন রেনগোল্ড। তাঁর হাসির শব্দ কানে বাজলো।

নদীর অদূরে এসে পড়েছি আমরা। পাকা ধানে পিঙ্গল পাহাড়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে সবুজ পাতায় ছাওয়া দু'একটি গাছ। বাত্তিসতার অনেক পেছনে পড়ে রয়েছি আমরা। যতদূর দৃষ্টি যায়—রাস্তাটি শূন্য, জন-মানবের সাড়াশব্দ নেই।

রেনগোল্ড বলতে লাগলেন আবার: ও'নীল যদি বুঝতেন—আধুনিকতম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হবে উপকথাগুলির! বিষয় বস্তুর উপর প্রাধান্য না দেওয়াই উচিত ছিল তাঁর···প্রয়োজন ছিল নতুন জীবনের অবতারণা। তিনি তা করেননি···তাই কোন আবেদন নেই তাঁর চিত্রটির···চিত্রটি হ'য়েছে স্কুলের পড়ার মতো।

প্রতিবাদ করলাম, আমার তো মনে হয়—তা'ই বরং সুন্দর হ'য়েছে। আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না রেনগোল্ড। বললেন: এখন 'ওডিসি'কে আমরা এমন করতে যাচ্ছি—যা' ও'নীল করতে চাননি কিংবা কল্পনা করতে পারেননি···শব-ব্যবচ্ছেদাগারে যেমন করে মানুষের দেহ চিরে ফেলা হয়, টুকরো টুকরো করে দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন পরীক্ষা করা হয়, ঠিক তেমনি করে খুলে ফেলতে হবে 'ওডিসি'টাকে···তারপর যুগোপযোগী করে জোড়া দিতে হবে······

ঠিক বুঝতে পারলাম না রেনগোল্ড-এর কথা। অসম্বদ্ধ ভাবে বললাম, 'ওডিসি'র উদ্দেশ্য সর্বজনপরিচিত: গৃহ, পরিবার ও

জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা, আর প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অগণিত বাধা—এ দু'য়ের তুলনা…হয়তো, যুদ্ধাবসানে যে সব যুদ্ধবন্দী ও রণনিপুণ যোদ্ধা কোন কারণে তাদের স্বদেশভূমি থেকে দূরে পড়ে থাকে, তারা প্রত্যেকেই এক একজন ছোটখাটো ইউলিসিস।

মুরগীর ডাকের মতো শব্দ করে হাসলেন রেনগোল্ডঃ আমিও তাই আশা করছিলাম—রণনিপুণ, বন্দী!…না না, তা নয় মলটেনি… এ শুধু বাহ্যিক ঘটনা…তা'তে 'ওডিসি' হ'বে একটি বিরাট অভিযানের চিত্র—বাত্তিসতা যেমন মনে করেন—ঠিক তেমনি…কিন্তু বাত্তিসতা হচ্ছেন চিত্র-নির্মাতা…আপনি তা' নন…আপনি জ্ঞানী, রুচিবান, বুদ্ধিমান…মাথা খাটাতে হবে, বুদ্ধি খরচ করতে হবে আপনাকে।

ঃ তাই তো করছি!

ঃ না, করছেন না। ভালো করে দেখুন, বেশ করে ভাবুন, সবার আগে—লক্ষ্য করুনঃ ইউলিসিসের মূল কাহিনী হলো—তাঁর সঙ্গে স্ত্রী পেনিলোপের সম্পর্ক…

কিছুই বললাম না এবার।

রেনগোল্ড বললেন, 'ওডিসি'তে সবার আগে নজরে আসে—কোন জিনিসটা? সেটা হলো—ইউলিসিসের বিলম্বিত প্রত্যাবর্তন…দীর্ঘ দশটি বছর লেগেছে ফিরে আসতে…এই দশ বছরের মধ্যে তাঁর প্রতি পেনিলোপের প্রেম থাকা সত্ত্বেও তিনি বার বার সুযোগ অবহেলা করছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন…হোমর বলেন, পেনিলোপ ছাড়া আর কোন চিন্তার স্থান ছিলনা ইউলিসিসের মনে…তাঁর একমাত্র কামনা ছিল—পেনিলোপের সঙ্গে পুনর্মিলন…কিন্তু আমরাও কি বিশ্বাস করবো হোমরের এ কথা?

একটু কৌতুক করে বললাম, যদি হোমরকেই বিশ্বাস না করি, তা'হলে আর কাকে বিশ্বাস করবো বলুন ?

: কেন ? নিজেদের—আধুনিক যুগের লোকেদের, যারা উপকথার অন্তর্নিহিত সত্যটুকু আবিষ্কার করতে পারে—তাদের।...দেখুন মলটেনি, একাধিক বার 'ওডিসি' পড়ে আমি এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে ইউলিসিস স্বেচ্ছায় গৃহে ফিরে আসতে চাননি—পেনিলোপের সঙ্গে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না তাঁর...আপনারা যা'ই বলুন না কেন......

চুপ করে রইলাম।

আমার নীরবতায় সাহস পেয়েই যেন, রেনগোল্ড বলতে লাগলেন—সত্যিই ইউলিসিস হচ্ছেন এমন একটি লোক যিনি সত্যিই তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন...পরে দেখবো—তার কারণ কী...ভয়েই মনের অবচেতনায় নিজের প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি...তাঁর অভিযানের উৎসাহ নিজের যাত্রাপথ দীর্ঘতর করারই এক অপরিজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়...সাইলা ও সেরিবডিস্, ক্যালিপ্‌সো, পলিফেমাস্, চার্চি ও দেব-দেবতারা তাঁর পথের বাধা সৃষ্টি করেনি, সত্যিকারের বাধা দিয়েছিল তাঁর অবচেতন মন। তাই, কোথাও এক বছর কোথাও বা দু'বছর আটকে ছিলেন তিনি।...

'ওডিসি'র এমন ভাষ্য কখনও কল্পনা করিনি। তাই আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম—ইউলিসিসের মতো একটি সহজ চরিত্রের এমন জটিল বিশ্লেষণে। মনস্তত্ত্ব নিয়েই কারবার করেছেন রেনগোল্ড। তাই এটা অস্বাভাবিক নয় তাঁর পক্ষে।

শুষ্ক কণ্ঠে বললাম, আপনার কথাটা ঠিক...কিন্তু আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না—কেমন করে......

: দাঁড়ান—দাঁড়ান—তা'হলে স্পষ্ট প্রমাণিত হ'লো—আধুনিকতম মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কার অনুসারে আমার ভাষ্যটি নির্ভুল…'ওডিসি' দাম্পত্য-বিরোধেরই কাহিনী…এই দাম্পত্য-বিরোধ-সম্বন্ধে বহুদিন বিতর্ক হয়েছে, বহু পরীক্ষা চলেছে, তারপর সুদীর্ঘ দশ বছর নিজের সঙ্গে সংগ্রামের পর ইউলিসিসের সংশয় ঘুচেছে, আর, যে অবস্থা তাঁর সংশয়ের জন্য দায়ী ছিল, তা'ই মেনে নিয়ে বিরোধের অবসান ঘটিয়েছেন তিনি…দশ বছর ধরে যত রকমে সম্ভব তিনি বিলম্ব করেন, দাম্পত্য জীবনের ছায়াতলে ফিরে না আসার অজুহাত দেখান —এমনকি আর একজনের পানিগ্রহণের কথাও চিন্তা করেন, অবশেষে আত্মদমন করতে না পেরে ঘরে ফিরে আসেন…তাঁর প্রত্যাবর্তনের মানে হ'লো—যে অবস্থায় পড়ে তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন ও দেশে ফিরতে অনিচ্ছুক ছিলেন, সে-অবস্থাকেই আবার মেনে নেওয়া…

: কী অবস্থা? ইউলিসিস্ কি ট্রয়-যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যেই গৃহত্যাগ করেননি?

অধীর ভাবে রেনগোল্ড বললেন, বাহ্যিক অবস্থার কথাই বলছি আমি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন—ইউলিসিস কোন ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে সংঘটিত দুঃসাহিক অভিযানের কাহিনী নয়—ইউলিসিস হ'লো—ইউলিসিসেরই মনের নাটক…তা'তে যা ঘটেছে সবই হলো ইউলিসিসের অবচেতন মনের প্রতীক…আপনি 'ফ্রয়েড' পড়েছেন নিশ্চয়?

: হ্যাঁ, খানিকটা পড়েছি।

: বেশ! 'ফ্রয়েড'ই হবে ইউলিসিসের মনোরাজ্যের পথপ্রদর্শক…ভূমধ্যসাগরের বদলে আমরা দেখবো—ইউলিসিসের অন্তর্জগৎ বা অবচেতনা।

: তবে এই গার্হস্থ্য নাটকের জন্য ক্যাপ্রিতে আসার কী দরকার ছিল? রোমের কোন আধুনিক প্রসাদের কক্ষে বসেই তো এ কাজ করা যেতো।

বিস্ময় ও বিরক্তিভরে আমার দিকে চাইলেন রেনগোল্ড। তারপর হাসলেন—যেন ব্যাপারটাকে লঘু করতে চাইলেন।

বললেন, ক্যাপ্রিতে গিয়েই আমরা এ বিষয়ে ধীর মস্তিষ্কে আলোচনা করবো আবার……মোটর চালানো ও 'ওডিসি' সম্বন্ধে আলোচনা একসঙ্গে হয় না, মিঃ মলটেনি ···· আপনি বরং মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালান···আমি বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যটা উপভোগ করি।

প্রায় ঘণ্টা খানেক নীরবে চললাম। সমুদ্রের ধার দিয়ে রাস্তা। অপর দিকে ছোট ছোট শিলাময় পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় ঝলমল করছে রোদ। সমুদ্র স্থির নয়। হলদে ও কালো বালির পাহাড়ের পরেই আবছা সবুজ জলরাশি। ঢেউ উঠছে অবসন্ন ভাবে। সাবানের ফেনার মতো শাদা জল তীরভূমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আরও দূরে—সমুদ্র গতিশীল, কিন্তু নিস্তরঙ্গ। সেখানেও সবুজ রঙ নীলাভ, তার উপরে খেলা করছে শুভ্র ফেনরাশি। আকাশেও তেমনি অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা। শাদা মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে, অনন্ত নীল আকাশ উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। সামুদ্রিক পাখিরা ঘুরছে, উড়ছে, জলের উপর ছোঁ মারছে—যেন দমকা হাওয়া ও ঘূর্ণি বায়ুর অনুকরণ করার চেষ্টা করছে।……

সমুদ্রের উপর দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। রেনগোল্ডের মুখে 'ওডিসি'র ব্যাখ্যা শুনে তাঁর পরিকল্পিত নাটককে গার্হস্থ্য-নাটক' বলে ভুল করিনি হয়তো। উজ্জ্বল নীল আকাশতলে এই বর্ণাঢ্য সমুদ্রের বিক্ষিপ্ত তরঙ্গরাজির মধ্যে, ভূমধ্যসাগরের বুকে অজ্ঞাত-

অপরিচিত রাজ্য-সন্ধানী ইউলিসিসের অর্ণবপোত কল্পনা করা কঠিন নয়। সবই রয়েছে এখানে। এই দীপ্তিময়, রৌদ্রোজ্জ্বল, বায়ুভরা, জীবধাত্রী বসুন্ধরাকে রৌদ্রহীন, অন্ধকার, বায়ুহীন, প্রাণস্পন্দনহীন একটি অবাস্তব নিভৃত মনোরাজ্যে রূপান্তরিত করতে চান রেনগোল্ড। তাঁর কাছে 'ওডিসি' মনস্তত্ত্বের অসঙ্গতির মধ্যে জড়িত একটি আধুনিক মানুষের অন্তর-রাজ্যের নাটক। মনে মনে ভাবলাম—এর চেয়ে নিকৃষ্ট চিত্রনাট্য কল্পনা করা যায় না। সিনেমার উপযোগী করতে হলে প্রয়োজন না থাকলেও সবই বদলাতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে 'ওডিসি'র মতো একটি সার্থক ও বাস্তব শিল্পকীর্তিকে শুধু অবাস্তব করতে হবে না, তার মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের অবতারণা করতে হবে। এর চেয়ে জঘন্য কী আর হতে পারে?

অদূরে সমুদ্র। রাস্তার ধারে বালুকাময় ক্ষেত্রে অজস্র আঙ্গুর গাছের সবুজ শীষ দেখা যাচ্ছে। তার পরে খানিকটা বেলাভূমি, সেখানে তরঙ্গ আহত হয়। তাই কালো হয়ে রয়েছে যায়গাটা, স্তূপীকৃত হয়েছে জঞ্জাল।

উৎসাহিত হয়ে বললাম, দেখুন রেনগোল্ড—এবার একটু হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারলে ভালো হয়···হাঁটুতে ব্যথা ধরে গেছে।

গাড়ি থামালাম। গাড়ি থেকে বেরিয়ে আঙ্গুর ক্ষেতের ভিতর দিয়ে সমুদ্র-তীরের দিকে এগোতে লাগলাম। বললাম, আট মাস ঘর থেকে বেরোই নি······গত গ্রীষ্মের পর আজই প্রথম সমুদ্র দেখছি ······চলুন না, একবার সমুদ্রের তীরে গিয়ে বসি···আসুন···আসুন···

নীরবে আমার অনুসরণ করতে লাগলেন রেনগোল্ড। ভাবলাম, আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি। তাই বললাম, কিছু মনে করবেন না···আমি অত্যন্ত দুঃখিত···হয়তো, যা' বলতে চেয়েছিলাম স্পষ্ট-

করে বলতে পারিনি···তবে, আপনার ব্যাখ্যাটা সত্যিই পুরোপুরি মানতে পারছি না······যদি শুনতে চান—বলতে পারি—কেন আপনার সঙ্গে একমত নই।

উৎকণ্ঠিত ভাবে রেনগোল্ড বললেন, বেশ তো, বলুন না।

ঃ দেখুন, সবটা বিশ্বাস করতে পারছি না···তবে বলছি না, আপনার ব্যাখ্যা একেবারে অচল···হোমরীয় কাব্যের—সাধারণতঃ রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি মাত্রেরই—বিশেষ গুণ হলো, তার অন্তর্নিহিত ভাব—যার হাজার অর্থ করতে পারি আমরা—আধুনিক যুগের লোকেরা······আমি বলতে চাই—'ওডিসি'র প্রকৃত সৌন্দর্য হলো—প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপর বিশ্বাস······তা'তে কোন ভাষ্য বা বিশ্লেষণের স্থান নেই···

সমুদ্রের দিকে চেয়ে বললামঃ হোমরের জগৎ—বাস্তব জগৎ···হোমর ছিলেন সেই যুগের—যখন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রেখে, বিরোধিতা করে নয়···হোমর তাই বিশ্বাস করতেন—দৃশ্যমান জগতের সত্যকে, শাদা চোখে যা' দেখছিলেন—তাই এঁকে গেছেন তিনি······এর তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা না করে অবিকল যেমন রয়েছে ঠিক তেমনটিই নেওয়া উচিত······

শান্ত হ'তে পারলাম না একথা বলে। রেনগোল্ডকে বোঝাবার চেষ্টা যেন পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

হোঃ হোঃ করে হেসে বিজয়গর্বে বলে উঠলেন রেনগোল্ড, বহির্মুখী···সম্পূর্ণ বহির্মুখী আপনার দৃষ্টি···যাদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী তাদের বুঝতে পারেন না আপনি······অবশ্যি ক্ষতি নেই তা'তে······আমার ও আপনার মধ্যে তফাৎ রয়েছে, তাই খুঁজে নিয়েছি আপনাকে······আপনার বহির্মুখিতা আমার অন্তর্মুখিতার সমতা রক্ষা করবে······দেখবেন—আমরা দু'জনে মিলে করবো এক অত্যাশ্চর্য শিল্প-সৃষ্টি······

বিরক্তি বোধ করলাম তাঁর এই স্থূলতায়। ভাবলাম, এমন একটা কিছু বলি—যা' শুনে অসন্তুষ্ট হন তিনি। পেছন থেকে শুনলাম পরিচিত কণ্ঠস্বর : রেনগোল্ড, মলটেনি……এখানে কী করছেন আপনারা…… সমুদ্রের হাওয়া খাচ্ছেন বুঝি……

চোখ ফিরিয়ে দেখলাম—বাত্তিসতা ও এমিলিয়া। বাত্তিসতা হাত নাড়তে নাড়তে বালির স্তূপ থেকে নেমে এগিয়ে আসছেন, তাঁর পেছনে আসছে এমিলিয়া। বাত্তিসতার সর্বাঙ্গে উল্লাসের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ। অতৃপ্ত, চিন্তাকুল ও বিব্রত দেখাচ্ছে এমিলিয়াকে।

বললাম, ভেবেছিলাম আপনারা অনেক দূর চলে গেছে এরই মধ্যে।

বাত্তিসতা বললেন, অনেক ঘুরে এলাম আমরা……রোমের কাছাকাছি একটি যায়গা দেখিয়ে এনেছি আপনার স্ত্রীকে……সেখানে একটি বাড়ি করছি কিনা!……তা'ছাড়া, রেল-লাইনের উপর দিয়ে যে রাস্তাটি—সেটি বন্ধ ছিল…আচ্ছা রেনগোল্ড, সব ভালো তো…'ওডিসি' সম্বন্ধে আলোচনা করছেন তো আপনারা?

: হ্যাঁ।

সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিলেন রেনগোল্ড।

বাত্তিসতার আবির্ভাবে তিনি যেন বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। আমার সঙ্গে বসে আলোচনা করাই তাঁর ইচ্ছা ছিল হয়তো।

: বাঃ, বেশ—বেশ!

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল এমিলিয়া, আমার দিকে এগিয়ে এসে বাত্তিসতা বললেন, তারপর—মহাশয়া, এবার আপনিই ঠিক করুন, আমাদের 'লাঞ্চ'টা কোথায় হবে—নেপ্‌লস্‌-এ, না ফর্মিয়ায়?

চমকে উঠে এমিলিয়া বলল, আপনারাই ঠিক করুন না।…… যেখানেই হোক—আমার কোন আপত্তি নেই।

: তা' কি হয়······না না, আপনি বলুন—বলতে হবে আপনাকে।

বাত্তিসতার পীড়াপীড়িতে এমিলিয়া বলল, তা'হলে নেপ্‌লস্‌-এ হবে···এখনও খিদে পায়নি আমার।

স্ফূর্তির সঙ্গে বাত্তিসতা বললেন, বেশ···তবে নেপল্‌স্‌-এই হোক্‌।

রেনগোল্ড প্রশ্ন করলেন, ক্যাপ্রির ষ্টীমার ছাড়বে কখন?

: আড়াইটেয়······আসুন, এবার যাওয়া যাক।

বাত্তিসতা আগে আগে চললেন। এমিলিয়া যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই রইল। কাছে আসতেই আমার হাত ধরে নীচু গলায় বলল, আমি এবার তোমার গাড়িতে আসছি···আপত্তি করো না লক্ষ্মীটি······

অবাক হয়ে গেলাম তার বাচনভঙ্গিতে।

: কেন—কী হয়েছে?

: কিছু হয়নি······বাত্তিসতা খুব জোরে গাড়ি চালান কিনা।

নীরবে হাঁটতে লাগলাম। গাড়ি দু'টি দাঁড়িয়েই ছিল। এমিলিয়া আমার গাড়ির দিকে এলো। নিজের গাড়ির দরজাটি খুলে রেখেছিলেন বাত্তিসতা। বললেন, আ-হা—মহাশয়া—আপনি কি আমার গাড়িতে আসছেন না?

ধীর কণ্ঠে এমিলিয়া জবাব দিল, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যাবো···নেপল্‌স্‌-এ গিয়ে দেখা হবে আবার।

ছুটে এসে বাত্তিসতা বললেন, দেখুন মিসেস মলটেনি, আপনি তো ক্যাপ্রিতে গিয়ে আপনার স্বামীর সঙ্গে দু'মাস থাকবেন, আর আমি—? নীচু স্বরে বললেন: জানেন, রোম-এ এই রেনগোল্ড-এর সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছি···সত্যিই ওর মতো লোকের সঙ্গে থাকা যে কী কষ্টকর···আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন বলে আপনার স্বামী আপত্তি করছেন না নিশ্চয়···কি বলেন, মলটেনি?

জোর করেই বললাম, না না···তবে—তবে এমিলিয়া বলছিল—আপনি খুব জোরে গাড়ি চালান।

উৎসাহিত হলেন বাত্তিসতা। কৌতুক করে এমিলিয়াকে বললেন, এবার শম্বুক গতিতে যাবো···তবু দোহাই আপনার, রেনগোল্ড-এর সঙ্গে পাঠাবেন না আমায়······যদি জানতেন—তার সঙ্গে থাকা কী কষ্টকর!······শুধু ফিল্ম—ফিল্ম ছাড়া কোন কথা বলেন না তিনি।

জানি না, কী হলো আমার। এই সামান্য কারণে বাত্তিসতাকে অসন্তুষ্ট করা ঠিক নয়। একটুও না ভেবে বললাম, এসো এমিলিয়া······মিঃ বাত্তিসতার জন্য এতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে পার না?······

······ঠিকই বলেছেন তিনি···রেনগোল্ড-এর সঙ্গে ফিল্ম ছাড়া আর কোন কথা বলা যায় না।

খুশি হয়ে বাত্তিসতা বললেন, সত্যি তাই।

এমিলিয়ার বগলের নীচে হাত দিয়ে ধরে বললেন, আসুন···আসুন······নিষ্ঠুর হবেন না আমার উপর······কথা দিচ্ছি—খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবো এবার······মনে হবে—পায়ে হেঁটে যাচ্ছি।

আমার দিকে একবার চাইলো এমিলিয়া। বুঝতেই পারলাম না তার দৃষ্টির অর্থ। বলল, বেশ······আপনি বলছেন যখন······আসুন।

এমিলিয়া হাঁটতে লাগলো বাত্তিসতার পাশাপাশি। বাত্তিসতা তার চেয়ে খর্বাকার। এমিলিয়া চলেছে ধীরে, আলস্যভরে, অসন্তুষ্ট চিত্তে। অপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছে তাকে। যে আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে সে দাঁড়িয়েছে তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন তার মূর্তিটি গড়া। তার দিকে চেয়ে মনে হলো—সে খুশি নয়।···কিন্তু কেন?······কী আহাম্মক আমি!······হয়তো সে থাকতে চেয়েছিল আমারই সঙ্গে, আমায়

বলতে চেয়েছিল—ভালবাসি তোমায়……! আর—আমি? আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি বাত্তিসতার সঙ্গে।

অনুশোচনা জাগলো মনে। এমিলিয়াকে ডাকবার জন্যই যেন—হাত বাড়ালাম। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে তখন। সে বাত্তিসতার সঙ্গে গাড়িতে উঠছে।……

বাত্তিসতার গাড়ি চললো, আমাদের ছাড়িয়ে গেল অনেক দূর, অবশেষে চলে গেল দৃষ্টিপথের বাইরে।

রেনগোল্ড হয়তো বুঝেছিলেন আমার মনের অবস্থা। আশঙ্কা করছিলাম—'ওডিসি'র কথাই তুলবেন তিনি। তা' না করে চোখের উপর টুপিটা টেনে নিয়ে চুপ করে বসলেন। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগলাম "ফুল্ স্পীড্"-এ। মন খারাপ হয়ে গেল। সমুদ্র ছাড়িয়ে মিষ্টি রোদ-মাখা স্নিগ্ধ গ্রামাঞ্চলে এসে পড়েছি। চারদিকে সবুজ প্রাণের স্পন্দন। রঙীন পাহাড়ের ধারে যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু ধূসর "অলিভ" গাছের সারি……সোনালি ফলে ঝলমল কমলার কুঞ্জ……পুরনো গোলাবাড়ির সামনে হলদে খড়ের গাদা……ছায়াভরা, মায়াময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য!

এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখেও দেখতে পেলাম না। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো মনের বিদ্বেষ ভাব। কেন যেতে দিলাম এমিলিয়াকে? খুঁজে পেলাম না তার কারণ। গুমোট হয়ে রইল অন্তর।

মাঠ, বনভূমি, সমভূমি ও পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে খিঁচুনির উপশমের মতো ধীরে ধীরে কমে এলো মনের অস্থিরতা।……

নেপল্স্-এর কাছাকাছি আসতেই দৃশ্যপটের রঙ বদলে গেল। রাস্তাটি সমুদ্রের দিকে বেঁকে গেছে, পাহাড়ের নীচ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি

আমরা, পাইন গাছের সারির ফাঁকে দিয়ে উপসাগরের উজ্জ্বল নীল জল দেখা যাচ্ছে।

অবশ হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ থরথর কেঁপে উঠলো সারা শরীর ও মন। বুঝতে পারলাম না—কী হলো আমার?

দ্বাদশ অধ্যায়

ক্যাপ্রিতে এসে জানলাম—অনেক দূরে, উপকূলের এক নির্জন প্রান্তে বাত্তিসতার বাগান-বাড়ি। রেনগোল্ডকে হোটেলে পৌছে দিয়ে বাত্তিসতা, এমিলিয়া ও আমি একটি সরু গলি বেয়ে বাগান-বাড়ির দিকে চললাম। দ্বীপের চারিদিকে একটি ছায়াঘেরা পথ। সেই পথ ধরে এলাম পাহাড়ের ধারে। তখন সূর্য অস্তোন্মুখ, রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেও চলে। পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলোয় দীপ্ত ঘন নীল সমুদ্র চোখে পড়ছে। বাত্তিসতা ও এমিলিয়া রয়েছে আগে আর আমি পেছনে। মুগ্ধ বিস্ময়ে নিসর্গ শোভা উপভোগ করছি। খুশি না হলেও শান্ত, প্রকৃতিস্থ বোধ করলাম।

রাস্তাটি পেরিয়ে আর একটি সরু পথের উপর আসতেই এমিলিয়ার বিস্ময় ও হর্ষধ্বনি শুনলাম। এর আগে সে এখানে আসেনি কখনও। এখান থেকে সমুদ্রের উপর দু'টি লাল পাহাড় বিচিত্র, বিস্ময়কর দেখায়। মনে হয়—আয়নার উপর দু'টি উল্কাপিণ্ড খসে পড়েছে আকাশ থেকে। উল্লসিত হয়ে এমিলিয়াকে বললাম: জান, এখানে একরকম নীল টিকটিকি আছে। পৃথিবীর আর কোথাও এমন টিকটিকি নেই—কারণ ওরা থাকে নীল আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে।

সে কৌতূহলী হ'য়ে শুনলো আমার কথা—যেন মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল আমার উপর তার বিদ্বেষ ভাব। আমার মনেও তখন জেগে উঠলো

নতুন আশা—এই নীল টিকটিকির মতো আমাদের অন্তরও হবে পবিত্র নীল, চিন্তার মসীরেখা মুছে যাবে, নীল আলোক ফুটে উঠবে অন্তরে ; টিকটিকি, সমুদ্র ও আকাশের মতো উজ্জ্বল, আনন্দময়, নির্মল হবে আমাদের জীবন।

পাথরের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ঘুরে গেছে রাস্তাটি। তারই অদূরে একটি শাদা প্রাসাদ, প্রাসাদের বারান্দাটি সমুদ্রের উপর ঝুলানো। এটিই হলো বাত্তিসতার বাগানবাড়ি। বেশি বড় নয় বাড়িটি—একটি শোবার ঘর ছাড়া মাত্র তিনটি ছোট ঘর। বাত্তিসতা চললেন আগে আগে। বললেন : বাড়িটি গাঁটের টাকা খরচ করে কিনতে হয়নি··· একজনের কাছে টাকা পেতাম—টাকার বদলে বাড়িটি পেয়েছি··· আসুন, একবার সব ঘরগুলো দেখে নিন, তারপর বিশ্রাম করবেন।

বাত্তিসতার পেছনে হাঁটতে লাগলাম। দেখলাম, আয়োজনের ত্রুটি করেননি তিনি। শোবার ঘরে ফুলদানিতে ফুল সাজানো, মেঝে ঝকঝক্ করছে, রান্নাঘরে ব্যস্ততা সুরু হয়েছে, আজ যেন তাঁর বাড়িতে উৎসব।···

ফিরে এসে বসলাম। এমিলিয়া বলল, এবার জামা কাপড় বদলাবো।

বাইরে গেল সে। ভাবলাম, আমিও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবো। কিন্তু বাত্তিসতা বললেন, বসুন না। একটি সিগারেট ধরিয়ে বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করলেন, দেখুন মলটেনি, রেনগোল্ড সম্বন্ধে কী মনে হয় আপনার ?

একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, সত্যিই—জানি না···কতটুকুই বা দেখেছি তাঁকে···কেমন করে বলবো···তবে মনে হয় খুব "সীরিয়াস"··· সবাই তাঁর সুনাম করে চিত্র-নির্দেশক হিসাবে।

কী যেন ভেবে বাত্তিসতা বললেন, দেখুন মলটেনি, আমিও তাঁকে ভালো করে জানি না···তবে জানি, তাঁর চিন্তা ও উদ্দেশ্য কী···তাছাড়া, উনি হচ্ছেন জার্মান, আর আমরা—আমি ও আপনি ইতালীয়··· দু'টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ, অনুভূতি ও জীবনবোধ স্বতন্ত্র······

চুপ করে শুনতে লাগলাম।

: দেখুন মলটেনি, আপনাকে—মানে একজন ইতালীয়কে—জার্মাণ রেনগোল্ডের সঙ্গে রাখতে চাই···কেন জানেন? · তাঁর সঙ্গে আমাদের তফাৎ রয়েছে অনেক···আপনাকে বিশ্বাস করি আমি···তাই ভেবেছি—যাবার আগে—শিগগিরই তো যেতে হবে আমাকে—আপনাকে কয়েকটি কথা বলে যাবো।

: বেশ তো বলুন না।

: এই ফিল্ম সম্বন্ধে আলোচনার সময় দেখেছি—রেনগোল্ড আমার সঙ্গে হয় এক মত হন কিংবা নীরব থাকেন, নিজে কিছু বলেন না··· কিন্তু আমি তো লোক চিনি···এমন যার মনোভাব তার উপর ভরসা করি কেমন করে?···আপনারা বিদগ্ধ······আপনারা ভাবেন—চিত্র-নির্মাতারা শুধু ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছু নয়, ব্যবসায়ই তাদের সব ···আর কিছু বোঝে না তারা···রেনগোল্ড তাই মনে করেন···তাঁর ধারণা, চুপ করে থাকলেই সহজে বোকা বানানো যায়···কিন্তু আসলে আমি খুব হুঁসিয়ার—একথা ভুললে চলবে না।······

: তার মানে—আপনি রেনগোল্ডকে বিশ্বাস করেন না?

: বিশ্বাস করি—আঁবার করি না···শিল্পী ও ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর উপর আমার আস্থা আছে······জার্মাণ হিসাবে, আমাদের জগৎ থেকে আলাদা একটি জগতের মানুষ হিসাবে—ভরসা করতে পারি না তাঁর উপর—

'অ্যাস্‌-ট্রে'র উপর সিগারেটটি রেখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এখন কথাটি পরিষ্কার করে বলা দরকার: আমি চাই—অনেকটা হোমরের 'ওডিসি'র মতো একটি ফিল্ম—অবশ্যি যতটুকু সম্ভব···হোমরের 'ওডিসি'র উদ্দেশ্য কী? হোমর বলতে চেয়েছিলেন—একটি অভিযানের কাহিনী যা আগাগোড়া গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখবে তাঁর পাঠক সমাজকে···এক কথায়—তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন অভিনব একটি কাহিনী···আর কোন উদ্দেশ্যই ছিল না তাঁর·· আমি চাই—আপনি হোমরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুন···হোমর তাঁর কাহিনীর মধ্যে দানব, অলৌকিক ঘটনা, ঝড়, ডাইনী ও চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন ···আপনিও তাই করুন······

একটু বিস্মিত হ'য়ে বললাম, আমরাও তো তা'ই করবো।

: হ্যাঁ হ্যাঁ তাই করুন···আপনি হয়তো ভাবছেন—আমি একটা আহাম্মক···কিন্তু জানবেন, আমি বোকা নই···বুঝলেন?

আমার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি। ধীর কণ্ঠে বললাম, আপনি কেন ভাবছেন যে আপনাকে আমি নির্বোধ মনে করি?

: আপনাদের ব্যবহারে তো তা'ই মনে হয়।

: ঠিক বুঝলাম না আপনার ইংগিত।

একটু শান্ত হ'য়ে আর একটি সিগারেট ধরিয়ে তিনি বললেন, আপনার মনে পড়ে—যেদিন আমার দপ্তরে আপনার সঙ্গে রেনগোল্ড-এর প্রথম পরিচয় হয় সেদিন আপনি বলেছিলেন, এমন কঠিন একটি চিত্রনাট্য আপনি লিখতে পারবেন না···না?

: হ্যাঁ।

: রেনগোল্ড কী বলেছিলেন?

: ঠিক মনে পড়ছে না।

: আচ্ছা দাঁড়ান—আমিই বলে দিচ্ছি···রেনগোল্ড আপনাকে বলেছিলেন—কিচ্ছু ভাবতে হবে না আপনাকে···তিনি একটি মনস্তত্ত্বমূলক ছবি তুলবেন—ইউলিসিস ও পেনিলোপের দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কে···না ?

আশ্চর্য ! যেমন ভেবেছিলাম, তেমন নন বাত্তিসতা।

বললাম, হ্যাঁ···ও ধরণের একটা কিছু বলেছিলেন হয়তো।

: বেশ···এখন দেখছি—চিত্রনাট্য তৈরী হয়নি, আরম্ভও হয়নি। তাই আপনাকে জানাচ্ছি—'ওডিসি' আমার কাছে ইউলিসিস বা পেনিলোপের দাম্পত্য-জীবনের চিত্র নয়···আধুনিক কালের কোন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন চিত্র নির্মাণ করতে হ'লে তো একখানি আধুনিক উপন্যাস নিয়ে রোমের কোন অভিজাত প্রাসাদের শোবার ঘর ও ড্রয়িং রুম-এর ছবি তুললেই হয়···যদি তাই চাইতাম—হোমর ও 'ওডিসি' সম্বন্ধে মাথা ঘামাতাম না···বুঝলেন, মিঃ মলটেনি ?

: হ্যাঁ।

: স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই······'ওডিসি' হ'চ্ছে—শুধু একটি দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী···এ সম্বন্ধে যা'তে আপনাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে, সেজন্য বলছি—আমি চাই সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটি ছবি······

: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন···তা'ই হবে···কোন সন্দেহ নেই তা'তে। অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বাত্তিসতা বললেন, সন্দেহ করছি না···তবে টাকাটা আমিই দিচ্ছি এ কথাটি মনে রাখবেন···সবই খুলে বললাম আপনাকে—যেন অপ্রিয়, ভুল বোঝাবুঝি না হয়··কাল সকালেই কাজ আরম্ভ করুন আপনি··· আপনার নিজেরই স্বার্থে সময় থাকতে সতর্ক করে দিলাম শুধু···আমি সত্যিই বিশ্বাস করি আপনাকে···রেনগোল্ড-এর কাছে আপনিই হবেন

আমার মুখপাত্র···প্রয়োজন হলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবেন—'ওডিসি' যুগে যুগে নরনারীর মনোরঞ্জন করেছে, চিরদিন করবেও—তার কারণ তা'তে রয়েছে কাব্য···আমি চাই—সেই কাব্য যেমনটি রয়েছে সবটাই থাকবে আমার চিত্রে।······

বুঝলাম, এবার শান্ত হয়েছেন বাত্তিসতা। তিনি আর সেই বিস্ময়কর ফিল্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করছেন না, বলছেন কাব্য সম্বন্ধে। বাস্তবের সীমানা ছাড়িয়ে আমরা চলে এসেছি শিল্প ও আত্মার ঊর্ধ্বলোকে।

মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, আপনি কিছু ভাববেন না মিঃ বাত্তিসতা ··হোমরের সবটুকু কাব্যই আপনি পাবেন—তাঁর মধ্যে আমরা যতটুকু খুঁজে পাই—সবই।

ঃ বাঃ বাঃ চমৎকার, এই তো চাই···আর বলতে হবে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বাত্তিসতা। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি।

আমায় একা রেখে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ভেবেছিলাম, ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলে আসবো আবার, কিন্তু বাত্তিসতার কথায় সে কথা ভুলে উত্তেজিত অস্থির-ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম। বাত্তিসতা আজই প্রথম ইংগিত করলেন, অর্থের জন্য আমি যে কাজটি নিরুদ্বেগে গ্রহণ করেছি সেটি কত দুরূহ। চিত্র-নাট্যটি লিখতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শিউরে উঠলাম সেকথা ভেবে। কেন? কেন এ অন্যায় কাজ করতে যাবো আমি? বাত্তিসতার সঙ্গে আলোচনাই-বা করবো কেন? রেনগোল্ড ও আমার মধ্যে যে আলোচনা হবে তা' গোপন রাখবো কেন? কেন আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করবো? একটি ভুয়ো পেশাদার চিত্রের সঙ্গে কেন নিজেকে জড়িত করবো? কেন, কেন এ সব?···

একটু আগেই ক্যাপ্রি আমার কাছে পরম রমণীয় ও শোভনীয় মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন একটি অনিশ্চিত কাজের দুর্ভাবনায়—আমার মতো শিক্ষিত রুচি-সম্পন্ন ব্যক্তির মনের চাহিদার সঙ্গে চিত্র-নির্মাতার চাহিদার সঙ্গতি রক্ষা করতে গিয়ে—সেই ক্যাপ্রির রূপ যেন বদলে গেছে। গভীর মনোবেদনার সঙ্গে মনে পড়লো—বাত্তিসতা প্রভু আর আমি ভৃত্য। প্রভুর আদেশ পালনের জন্য সবই করতে হবে। প্রভুর কর্তৃত্ব এড়াবার জন্য শঠতা বা চাটুকারিতার আশ্রয় নেওয়া আরও অসম্মানকর। এক কথায়, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে আমি আমার মনটা বিকিয়ে দিয়েছি এক শয়তানের কাছে। যে কোন শয়তানের মতোই সে নীচ—কড়ায়-গণ্ডায় আমায় সবটুকু আদায় না করে সে ছাড়বে না আমাকে। সরল সহজ স্পষ্ট ভাষায় বাত্তিসতা বলেছেন 'টাকাটা আমিই দিচ্ছি'।

বার বার কানের কাছে বাজতে লাগলো ঐ কটি কথা। ভাবতে ভাবতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। বাত্তিসতার কাছ থেকে দূরে পালাবার ইচ্ছা হলো। জানলাটি খুলে ছাদে এসে দাঁড়ালাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাত্রির আকাশের বুকে অদৃশ্য চাঁদের মৃদু আলোয় হাসছে ছাদটি। ছাদ থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে একটি সিঁড়ি। রাস্তাটি দ্বীপের চারদিকে ঘুরে গেছে। ভাবলাম, একবার নিচে নেমে বেড়াবো, কিন্তু এখন আর সময় নেই—রাত হয়েছে, পথে লোকজন নেই। এখন ছাদে থাকাই বাঞ্ছনীয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম অন্ধকারের ভিতর দিয়ে।

নক্ষত্র-খচিত আকাশতলে দ্বীপের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু, কালো পাহাড়গুলি। নিচের পাহাড় উপরের পাহাড়গুলির চেয়ে অস্পষ্ট। দিগন্তে সীমাহীন অন্ধকার, অনন্ত নীরবতা। অনেক নিচে—ছোট্ট খড়ির নুড়ি-ময় সৈকতে ঢেউয়ের জলের অস্ফুট কোলাহল কানে বাজছে। না, হয়তো ভুল করছি। জোয়ারের গতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত, প্রসারিত শান্ত সমুদ্রের নিঃশ্বাস ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সবই নিস্তব্ধ, নিঝুম। এমনকি, বাতাসের লেশমাত্রও নেই। চোখ তুলে দিগন্তের পানে চাইলাম। দূরে বাতি-ঘরে ক্ষীণ আলো চোখে পড়লো। মিট্ মিট্ করে আবার দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠছে আলোটি। থেকে থেকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে সেই আলোক, আবার হারিয়ে যাচ্ছে অনন্ত রাত্রির দিগন্ত-বিসারী অন্ধকারে। এ ছাড়া আর কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই চারদিকে।

নীরব রাত্রির প্রভাবে শান্ত হয়ে উঠছিল মন। তবু, স্পষ্টই বুঝলাম—একটির পর একটি দুঃখের আঘাত আসছে আমার জীবনে, পৃথিবীর সবটুকু সৌন্দর্য এই অখণ্ড বেদনার পথে ক্ষণিকের বাধা সৃষ্টি করতে পারে হয়তো···তবে, আমার দুঃখের তিমির রাত্রির অবসান হবে না কখনও।

কতক্ষণ এমনিভাবে অন্ধকারের দিকে চেয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ মনে জেগে উঠলো সেই অবাঞ্ছিত চিন্তা—এমিলিয়ার চিন্তা।······ বাত্তিসতা ও রেনগোল্ড-এর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে আমার, আমি রয়েছি হোমরের কাব্য-বর্ণিত একটি স্থানে। তাই 'ওডিসি' চিত্র-নাট্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেল আমার মন। স্মরণের কোন্ অজ্ঞাত উৎস থেকে বেরিয়ে এলো 'ওডিসি'র শেষ সর্গের অংশটি—যেখানে আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁর পরিণয়-শয্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিচ্ছেন ইউলিসিস,

আর স্বামীকে চিনতে পেরে স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়ে পেনিলোপ তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বার বার পড়ে ও মনে মনে আবৃত্তি করে কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে পেনিলোপের সেই উক্তি :

আমার উপর রাগ করো না, ইউলিসিস……তোমার প্রতিটি কাজেই তো তুমি বিজ্ঞতার পরিচয় দাও……আমাদের এ দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী দেবতারা……তাঁদের ইচ্ছা ছিল না যে আমাদের যৌবনের স্বপ্ন-রাঙা দিনগুলি মিলনের মধুর আনন্দে কেটে যাক, আমরা যথারীতি দেখি জরায় শুভ্র হয়ে গেছে দু'জনের কেশদাম, তবু প্রেম-বন্ধন শিথিল হয়নি এতটুকুও, অমলিন রয়েছে আমাদের প্রেম……তাই দেবতারাই আমাদের জীবনে এই দুর্ভাগ্য এনে দিয়েছিলেন……

অনুবাদে হোমরের ভাষার অবিকল ধ্বনি-মাধুর্য না থাকলেও এই উক্তির মধ্যে যে আবেগ রয়েছে তাতেই যথেষ্ট আনন্দ পেতাম অংশটি পড়ে। এখানে দেখি—অকৃত্রিম প্রেমাবেগ, যা বার্ধক্যেও চির অমলিন। আমাদের জীবনে সে-আশা আর নেই। হায়, যদি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে এমন সম্ভাবনা থাকতো! কোন্ এক দুর্জ্ঞেয় বিপর্যয়ে সফল হতে পারছে না আমার স্বপ্ন। কেন? মনে হলো—বাগান-বাড়ির যে-কক্ষে এমিলিয়া রয়েছে সেখান থেকেই পাবো এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর।

সমুদ্রের দিকে পেছন ফিরে জানালার কাছে গেলাম। দাঁড়িয়ে রইলাম ছাদের এক কোণে। সেখান থেকে খাবার ঘরের ভিতরটা দেখা যায়, অথচ ঘর থেকে বাইরের কিছু দেখা যায় না।

দেখলাম—বাত্তিসতার সঙ্গে এমিলিয়া রয়েছে সে-ঘরে। এমিলিয়া দাঁড়িয়েছে একটি সুরাদানির পাশে, উপুড় হয়ে একটি কাচের গেলাসে

সরবত তৈরী করছেন বাত্তিসতা। এমিলিয়া তাঁর দিকে চেয়ে আছে উদ্বিগ্ন উদ্ধত দৃষ্টিতে। সে যেন বাত্তিসতার হাত থেকে গেলাসটি নিতে চায়। সন্দেহ ও হতাশা-মাখা তার দৃষ্টি লক্ষ্য করলাম। সরবত তৈরী হলো, একটি গেলাস এমিলিয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন বাত্তিসতা। চমকে উঠলো এমিলিয়া—যেন ধ্যানভঙ্গ হলো। হাত বাড়িয়ে গেলাসটি নিল এক হাতে, আর এক হাত চেয়ারে ঠেস দিয়ে রাখলো। বুক সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো—সে দেহ দান করতে প্রস্তুত। কিন্তু তার মুখে অস্থিরতার ভাব আমার দৃষ্টি এড়াল না। দুঃসহ নীরবতা ভাঙবার জন্যই যেন কী বললো এমিলিয়া, তারপর সন্তর্পণে গেলাসটি ধরে সামনের দিকে এলো।

যা ভেবেছিলাম তাই! ঘরের মাঝখানে এসে এমিলিয়ার মুখের কাছে নিজের মুখ আনলেন বাত্তিসতা। মৃদু আপত্তি জানালো এমিলিয়া, ইশারায় গেলাসটি দেখালো। বাত্তিসতা ঘাড় নাড়লেন, আরো কাছে টেনে নিলেন এমিলিয়াকে। গেলাসটি উল্‌টে গেল। ভাবলাম—এবার চুম্বন-পর্ব স্থরু হবে। কিন্তু বাত্তিসতার চরিত্র ও পাশবিকতা ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না। চুমা খেলেন না তিনি। এক টানে এমিলিয়ার গায়ের জামাটি ছিঁড়ে ফেললেন। এমিলিয়ার একটি কাঁধ নগ্ন হয়ে গেল। বাত্তিসতার মাথাটি এমিলিয়ার উপর নেমে এলো। এমিলিয়া নিশ্চল—যেন শেষ পর্বের অপেক্ষা করছে। চুম্বনের সময়ও দেখলাম, এমিলিয়ার মুখ ও চোখের দৃষ্টি তেমনি অধীর ও উদ্বিগ্ন।

হঠাৎ জানালার দিকে চাইলো এমিলিয়া। সে যেন দেখতে পেলো আমায়, অবজ্ঞা সূচক ভঙ্গি করে এক হাতে জামাটি চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।……

মুখ ফিরিয়ে ছাদে পায়চারি করতে লাগলাম আবার। স্তম্ভিত বিহ্বল হয়ে পড়লাম। যা জানি, যা ভেবেছি—এ যে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর! এমিলিয়া আমাকে ভালবাসে না আর; তার নিজের কথায় বলতে গেলে—ঘৃণা করে। কিন্তু আজ সে প্রতারণা করেছে আমার সঙ্গে। ভুল ভেঙেছে আমার, উদ্ধার করেছি সত্য। অকারণেই অবজ্ঞার বোঝা হয়ে বেড়িয়েছি আমি। আজ আমিই অবজ্ঞা করতে পারি তাকে। আমার প্রতি তার আচরণ যেন একটা ষড়যন্ত্র। আবিষ্কার করেছি এমিলিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা। আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হলো এই নির্মম ও যুক্তিপূর্ণ চিন্তায়। ছাদের ধারে থামের দিকে আসতেই অসহ্য বেদনা জাগলো মনে। না, না, যা দেখেছি তা, সত্য নয়—সত্য হতে পারে না!···হ্যাঁ, বাত্তিসতাকে চুমো খেতে দিয়েছে এমিলিয়া। তা'তে কি আমার দোষ কেটে গেল? তাকে ঘৃণা করার অধিকার সত্যিই কি আছে আমার? আছে—অব্যাহত আছে আমার পূর্ব অধিকার। না, আমিই ভুল করেছি। সে অবিশ্বাসিনী নয়, বিশ্বাসঘাতকতার মূল এখনও রয়েছে অনাবিষ্কৃত।······

মনে পড়লো—বাত্তিসতার প্রতি সর্বদাই অব্যক্ত ঘৃণার ভাব দেখিয়েছে এমিলিয়া। সকালেও বাত্তিসতার সঙ্গে আসতে আপত্তি জানিয়েছে, দু'বার বলেছে—তাঁর সঙ্গে থাকতে চায় না সে। তার সেই আচরণ ও এই চুম্বনের সাদৃশ্য কোথায়? নিঃসন্দেহে এই প্রথম চুম্বন। এমিলিয়াকে একা পেয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন বাত্তিসতা। সুতরাং এখনও সময় আছে। জানতে হবে—কেন বাত্তিসতাকে চুমো খেতে দিল এমিলিয়া? বার বার মনে হলো—সেই চুম্বন সত্ত্বেও আমাদের সম্পর্ক রয়েছে অপরিবর্তিত। তবে, আগের মতো আমাকে ভাল না বাসার বা ঘৃণা করার অধিকার রয়েছে এমিলিয়ার।

এই মুহূর্তেই প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে আত্মপ্রকাশ করার ইচ্ছা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভাবতে লাগলাম—কেন এমন করলো এমিলিয়া? তবু, তাকে অপ্রস্তুত করার প্রবৃত্তি হলো না। আমার অতর্কিত আবির্ভাবে সত্য আবিষ্কারের আশা নির্মূল হবে, এমিলিয়াকে ফিরে পাওয়ার আশাও লুপ্ত হয়ে যাবে চিরতরে। সুতরাং বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তা'ছাড়া, ঘটনাস্থলে আত্মপ্রকাশ না করার আরও একটি কারণ আছে। 'ওডিসি' চিত্র-নাট্য রচনার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার এ-ও একটি সুযোগ। যে চুম্বন-পর্ব আমি নিজের চোখে দেখেছি—সেটি আসলে এক চরম মিথ্যাচার। সেই মিথ্যাচারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করছে আমার সমস্ত জীবন—আমার সঙ্গে এমিলিয়ার সম্পর্কে ও আমার কাজে। সেই মিথ্যাকে চিরদিনের জন্য দূর করে দেবার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।......

ঝড়ের বেগের মতো এ-সব চিন্তার উদয় হলো আমার মনে। জানালা খুললেই যেমন বাইরের দমকা হাওয়ায় ধুলো বালি ময়লা ও আবর্জনা ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়, আবার জানালা বন্ধ করলেই ঘরটি নিস্তব্ধ নীরব হয়,—এ-ও ঠিক তেমনি।......

সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকারের মধ্যে। · ···

বুঝলাম, মনের চিন্তা ও আবেগ নেই আর। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে জানালার কাছে এসে জানালা খুলে খাবার ঘরে নেমে এলাম। হয়তো অনেকক্ষণ ছিলাম ছাদের উপর। এসে দেখলাম—বাত্তিসতা ও এমিলিয়া খেতে বসেছে, অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে তাদের, ছেঁড়া জামাটি বদলে ফেলেছে এমিলিয়া। তার বিশ্বাসঘাতকতার এই মর্মান্তিক জাজ্বল্যমান প্রমাণ পেয়ে ব্যথা পেলাম।

আমায় দেখে বাত্তিসতা সোৎসাহে বলে উঠলেন, আমরা ভেবে-

ছিলাম—আপনি নৈশ-সন্তরণে গেছেন…এতক্ষণ কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন, বলুন তো ?

নীচু গলায় বললাম, একটু বাইরে গিয়েছিলাম।

আমার দিকে একবার চোখ তুলে চেয়ে চোখ নামালো এমিলিয়া।

সন্দেহ রইল না—সে দেখেছে যে ছাদের উপর থেকে আমি তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করেছি !

চতুর্দশ অধ্যায়

নির্বিকারভাবে বসে নিঃশব্দে খাচ্ছে এমিলিয়া। বিস্ময়ের সীমা রইল না আমার। ভেবেছিলাম, অপ্রতিভ হয়ে পড়বে সে। আমার ধারণা ছিল—সে ছলনা জানে না। আজ মিথ্যে হয়ে গেল সে ধারণা।

মনের নিদারুণ স্ফূর্তি গোপন না করে বিজয়ীর উল্লাসে অনর্গল বকে যাচ্ছেন, খাচ্ছেন, সুরা পান করছেন বাত্তিসতা। ভদ্রলোকের আমিত্ব গর্ব দেখে মনে হচ্ছে—তাঁর দৃঢ় ধারণা, এমিলিয়াকে জয় করেছেন তিনি। তাই ময়ূরের মতো গর্বভরে পেখম ধরে তাঁর বিচিত্র সুন্দর পক্ষগুলি দেখাচ্ছেন বিজিতকে। স্বীকার করতেই হবে—নির্বোধ নন বাত্তিসতা। পরিহাসের মাধ্যমেই তিনি তাঁর গর্ব প্রকাশ করছেন। বেশ রসালো কথা বলছেন তিনি। তাঁর আমেরিকা ভ্রমণ ও হলিউড-এর ষ্টুডিও পরিক্রমা সম্বন্ধে গল্প করছেন। তবু বিরক্তি বোধ করলাম। মনে হলো—যা দেখেছি তা সত্ত্বেও এমিলিয়া যেন তাঁর উপর বিরূপ। …না-না, আমারই ভুল। এমিলিয়া তাঁর উপর বিরূপ নয়, বরং সন্তুষ্ট। দেখলাম, যখনই বাত্তিসতা কথা বলছেন তখন কামার্ত না হলেও

কৌতূহলী, বিস্ময়াকুল ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে উঠছে এমিলিয়ার দৃষ্টি। বাত্তিসতার পৌরুষের অহঙ্কারের মতই অসহ্য মনে হলো তা'। মনে পড়লো—ঠিক তেমনি আর একটি দৃষ্টির কথা। কিন্তু স্মরণ করতে পারলাম না—কোথায় দেখেছি এই দৃষ্টি। ডিনারের শেষে মনে পড়ে গেল। অনেক দিন আগে ফিল্ম ডিরেক্টার পাসেত্তির বাড়িতে যখন লাঞ্চ্ করছিলাম তখন তাঁর স্ত্রীর চোখে অনুরূপ দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিলাম। সে-দৃষ্টিতে ছিল প্রেম, বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও আত্ম-নিবেদন। বাত্তিসতার সঙ্গে এমিলিয়া এখনও সে-অবস্থায় এসে পৌছোয়নি, কিন্তু বুঝলাম—তার দৃষ্টির মধ্যে মিসেস পাসেত্তির মনোভাবের বীজ লুকানো রয়েছে। বাত্তিসতা নিজেকে প্রকাশ করেছেন, এমিলিয়া খানিকটা বশীভূত হয়েছে, পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার আসন্ন। এমিলিয়া ও বাত্তিসতাকে চুম্বনরত অবস্থায় দেখে যতটুকু মনঃকষ্ট পেয়েছিলাম তার চেয়েও বেশি বেদনা অনুভব করতে লাগলাম।

বেদনার ছায়া ফুটে উঠলো আমার মুখে। বাত্তিসতা হয়তো লক্ষ্য করলেন। আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে মলটেনি ?······ক্যাপ্রিতে এসে কি খুশি হননি আপনি ?······ খারাপ কিছু হয়নি তো ?

: কেন ?

: কারণ—আপনাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে······

বাত্তিসতার আক্রমণের ধরণই হলো এমনি। তিনি জানেন, আগে আক্রমণ করাই আত্মরক্ষার সর্বোত্তম উপায়।

বললাম, ছাদে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলাম······তখন থেকেই মনটা খারাপ হয়ে গেছে অকারণে—

আশ্চর্য হয়ে গেলাম নিজের এই অভাবনীয় ক্ষিপ্রতায়।

আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, ওঃ—তাই নাকি……কেন?

এমিলিয়ার দিকে চাইলাম। তাকেও বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখলাম না। তারা দু'জনেই নিঃসন্দিগ্ধ। এমিলিয়া নিশ্চয় দেখেছে আমায়, আর হয়তো বাত্তিসতাকে বলেছে একথা। তবু, তারা নির্বিকার, নিশ্চিন্ত। হঠাৎ বলে ফেললাম, আপনাকে একটা কথা বলবো?

: নিশ্চয় নিশ্চয়……বলবেন বৈ কি……আমি সব সময় সহজ স্পষ্ট কথাই পছন্দ করি……

: দেখুন, যখন সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিলাম, তখন মনে হয়েছিল—আমি নিজেরই স্বার্থে এখানে এসেছি……আপনি তো জানেন, আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা—রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাটক লেখা……তাই ভেবেছিলাম—আমার কাজের পক্ষে প্রশস্ত হবে এ যায়গাটি, এখানে সৌন্দর্য, নীরবতা, শান্তি—সবই রয়েছে, আর সঙ্গে রয়েছে স্ত্রী…… কোন ভাবনা নেই……তারপর মনে হলো—এই রমণীয় যায়গায় এসেছি নিজের জন্য নয়, এসেছি—একটি ফরমায়েসি চিত্র-নাট্য লিখতে…চিত্র-নাট্যটি ভালোই হবে, কিন্তু তা'তে আমার কোন স্বার্থ নেই……আমি চিত্র-নাট্যটিকে সাধ্যমত ভালো করবার চেষ্টা করবো, তারপর সেটি দেবো রেনগোল্ড'কে, রেনগোল্ড তাঁর খুশি মতো ব্যবহার করবেন চিত্র-নাট্যটি……আমি আমার পারিশ্রমিক পাবো…জীবনের তিন চারটি মাস সময় নষ্ট হবে…জানি—এসব কথা আপনাকে বলা উচিত নয়…তবু বলছি, আপনি বলতে বলেছেন, তাই…এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন—আমার মন খারাপ হবার কারণ কী……

কিন্তু এ কী? যা বলতে চেয়েছিলাম! আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আচরণের কথা না বলে একথা বললাম কেন? জানি না, দুর্বল

হয়ে পড়েছিলাম হয়তো। দুর্বলতার জন্যই এমনি পরোক্ষ-ভাবে এমিলিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ইংগিত করলাম। আমার এই অশুভ ভূমিকায় কিছুমাত্র অস্বস্তির ভাব দেখলেন না বাত্তিসতা। এমিলিয়াও না।

গম্ভীরভাবে বাত্তিসতা বললেন, আমি জানি মলটেনি, অনবদ্য চিত্র-নাট্যই লিখবেন আপনি······

সত্যিই, ভুল করে ফেলেছি। তাই প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম : দেখুন, আমি পেশাদার চিত্র-নাট্যরচয়িতা নই···থিয়েটারের নাটক লেখাই আমার অভ্যেস।···আমার জীবনে একটিমাত্র আদর্শ রয়েছে···সে-আদর্শ হলো—রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাটক রচনা···আমি তা পারি না কেন ?··· কারণ, আজকের পৃথিবীটা এমনভাবে তৈরী যে কেউ তার ইচ্ছামতো কিছু করতে পারে না—অপরের ইচ্ছাতেই চলতে হয় তাকে···তার কারণ–টাকার প্রশ্নটাই সব সময় বড় হয়ে ওঠে···আমাদের কাজে, অস্তিত্বে, উচ্চাকাঙ্ক্ষায়—এমনকি, যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে সম্পর্কেও সর্বাগ্রে আসে টাকার প্রশ্ন······

বুঝলাম, উত্তেজিত হয়েছি। যে আমার স্ত্রীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে এ সব কথা বলছি কেন ?

কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামান না বাত্তিসতা। তিনি বললেন, দেখুন মলটেনি, আপনার কথা শুনে আমার মনে পড়ে সে-সময়কার কথা—যখন আপনারই মতো বয়স ছিল আমার······

: ওঃ—সত্যিই বলছেন, মিঃ বাত্তিসতা ?

: হ্যাঁ···খুবই গরীব ছিলাম আমি···আপনার মতো আমারও একটা আদর্শ ছিল···তবে, জানতাম না—কী ছিল সেই আদর্শটা··· তবু, একটা ছিল—না, অনেকগুলি আদর্শ ছিল···তারপর একজনের সঙ্গে

দেখা হলো···তিনি আমায় কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন···সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ······

একটু নীরব রইলেন বাস্তিসতা। ভাবলাম, নিশ্চয় কোন চিত্র-নির্মাতার কথা বলবেন। বাস্তিসতার এই জীবন তাঁরই সঙ্গে শুরু হয়েছিল নিশ্চয়।

: আজ আপনি আমায় যে কথা বললেন—আমিও তাঁকে ঠিক এ কথাই বলেছিলাম···তিনি আমায় বলেছিলেন—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ জানতে পারে—সত্যিই সে কী চায়, ততক্ষণ কোন আদর্শের কথা চিন্তা না করাই ভালো······নিজের পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শকে স্মরণ করে পালন করা দরকার······তাঁর উপদেশ পালন করেছিলাম—কোন অসুবিধায় পড়িনি কখনও··· তবে হ্যাঁ, আপনার আদর্শ কী? ··আপনার আদর্শ নাটক লেখা··· বেশ তো, তা'ই লিখুন না।

: নাটক লিখবো?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, লিখবেন বৈকি···লেখার ইচ্ছে থাকলে লিখতে পারবেন—এ কাজ করেও···সাফল্যের গুপ্ত মন্ত্র কী, জানেন মলটেনি?

: কী?

: ষ্টেশনে বুকিং আপিসের সামনে সকলকেই টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়—পালা এলেই যে যেখানে যেতে চায় সেখানকার টিকিট কিনতে পারে···যেমন ধরুন, কেউ যদি অষ্ট্রেলিয়া যেতে চায় সে অষ্ট্রেলিয়ার টিকিট পায়, আর যারা বেশিদূর যেতে চায় না—তারা হয়তো ক্যাপ্রির টিকিটও পেয়ে থাকে···বুঝলেন?

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন বাস্তিসতা। বললেন, আপনিও অনেক দূর দেশের টিকিট পেতে পারেন···আমেরিকা কেমন হয়?···

—হ্যাঁ, ঠিক তেমনি করে—জীবনেও লাইনে দাঁড়াতে হবে···বুঝলেন তো এবার ?

মুখ টিপে হাসলেন বাত্তিসতা। এমিলিয়ার মুখেও ম্লান হাসি দেখে বুঝলাম—বাত্তিসতার প্রতি তার বিদ্বেষ ভালবাসার রূপ নিয়েছে। মেসেস পাসেত্তির দৃষ্টি নতুন করে দেখতে পেলাম এমিলিয়ার চোখে। কথার কাঁটা বিঁধলো বুকে, দুর্বিষহ মর্ম-বেদনার তলে হারিয়ে গেল আমার ঈর্ষা।

ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বিষাদে ভরে উঠলো সারাটি অন্তর।

অপ্রত্যাশিতভাবে ডিনার শেষ হলো। বাত্তিসতার কথাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনার পর আমাকে যেন মনে পড়লো এমিলিয়ার। কিন্তু সে এমন ভাব দেখালো যে তাতে আমার অস্থিরতা আরো বাড়লো।

এমিলিয়াকে বললাম, একবার ছাদে গেলে হয় না? চাঁদ উঠেছে এতক্ষণে—

সে শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল, আমি যাবো না—ঘুমাবো এবার···বড় ক্লান্ত হয়েছি······

আর কিছু না বলে আকস্মিকভাবে বিদায় নিল এমিলিয়া।

তৃপ্ত, উৎফুল্ল দেখালো বাত্তিসতাকে। এমিলিয়ার মনে তিনি যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চান—এ যেন তারই ইংগিত। কিন্তু আমার অধীরতা দ্বিগুণ বাড়লো। ক্লান্ত হলেও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। ঘুমোবার অজুহাতে বাত্তিসতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।······

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভিতরের দরজা দিয়ে এমিলিয়ার ঘরের সামনে উপস্থিত হলাম।

দরজায় টোকা মারতেই এমিলিয়া এসে আমায় ভিতরে ডাকলো। বিছানার উপর চিন্তিত মনে বসেছিল সে। বিরক্ত ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, বলতো আমার কাছে আর কী চাও তুমি?

: কিছু না, এসেছিলাম—রাত্রির জন্য তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে।

: না, জানতে চাও—আজ সন্ধ্যায় বাত্তিসতার সঙ্গে তোমার আলোচনা সম্বন্ধে আমার মত কী?…যদি জানতে চাও—শোন: তোমার কথাবার্তা স্বধু যে সময়োচিত হয়নি এমন নয়, হাস্যকরও হয়েছে।

: কেন?

: তোমায় বুঝতে পারি না—সত্যিই বুঝতে পারি না…চিত্রনাট্য লিখে টাকা পাচ্ছ, তবু বলছ—তোমার ভালো লাগে না এ কাজ… থিয়েটারের বই লেখাই তোমার ইচ্ছে…কিন্তু তুমি কি এই সহজ কথাটি বুঝতে পার না—আজ ভদ্রতার খাতিরে বা চক্ষু লজ্জায় কিছু না বললেও কাল বাত্তিসতা ভাববেন এ সম্বন্ধে, দেখবেন—যাতে তোমায় আর কাজ না দেওয়া হয়?

ঠিক করেছিলাম চুপ করে থাকবো।

কিন্তু তার এই অবজ্ঞামাখা কণ্ঠস্বর শুনে কিছু না ভেবেই বললাম, তবে এ কথা জেনো—যা বলেছি ঠিকই বলেছি……এ কাজ আমার ভালো লাগে না—কখনও ভালো লাগেনি…তা'ছাড়া, এ-ও ঠিক নয় যে আমি এ কাজই করবো।

: আল্‌বৎ করবে।

এমন অপমান আশা করিনি তার কাছ থেকে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে একটু সংযত করে নিলাম নিজেকে। বললাম, না-ও তো করতে পারি……অবশ্যি আজ সকাল অবধি ভেবেছিলাম—করবো…কিন্তু আজকের মধ্যেই এমন সব ঘটনা ঘটেছে যার ফলে হয়তো কাল সকালেই জানিয়ে দিতে বে—কাজ ছেড়ে দিলাম।

প্রতিহিংসা-বশে, ইচ্ছা করেই কথাগুলো বললাম। আমায় ব্যথা দিয়েছে এমিলিয়া। তাই জানালা দিয়ে যা দেখেছি তারই ইংগিত করে ব্যথা দিতে চাইলাম তাকে।

আমার দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো এমিলিয়া, কী সব ঘটনা ঘটলো আবার?

: অনেক—অনেক ঘটনা।

: কিন্তু—কী ঘটনা, খুলেই বল না।

এড়িয়ে যেতে চাইলাম তাকে। বললাম, ফিল্ম সংক্রান্ত ঘটনা… ও-সব বলে কাজ নেই।……

: কী হয়েছে—বলতে চাও না কেন?

: ও-সব ভালো লাগবে না তোমার।

: তা'ই হবে হয়তো…তবে, কাজ ছাড়বার সাহস নেই তোমার… ঠিক কাজ করে যাবে।

: ও কথা ভাবছ কেন?

: কারণ—আমি তোমায় জানি…কতবার তো শুনলাম—এ কাজ করবো না, কিন্তু দেখছি—নির্বিবাদে করে যাচ্ছ…চিত্রনাট্য-সম্পাদনার সব অসুবিধেই শেষ পর্যন্ত দূর হ'য়ে যায়।

: হ'তে পারে…কিন্তু এবার অসুবিধেটা চিত্রনাট্যে নয়।

: তবে কোথায় ?

: অসুবিধেটা হলো ব্যক্তিগত।

: মানে ?

এর ঠিক উত্তর হবে যদি বলি: বাত্তিসতা তোমায় চুমো খেয়েছে—তাই……

কিন্তু না। আত্মদমন করলাম। এমনি আরো কতো না-বলা কথাই তো রয়েছে আমাদের মধ্যে।

বললাম: মানে তুমি ভালো করেই জান · ডিনারের টেবিলেই তো বলেছি, অপরের জন্য কাজ করতে পারছি না আমি,—নিজের জন্য কাজ করতে চাই।

: কে বারণ করেছে তোমায় ?

: তুমি……তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়,……আমার জীবনে তোমার উপস্থিতি—আমাদের বর্তমান সম্পর্ক…আগেই তো বলেছি—তুমি আমার পরিণীতা স্ত্রী, তোমারই জন্য এ সব কাজ করি…তুমিও তা ভালো করেই জান…তা'ছাড়া, ধার রয়েছে অনেক—ফ্ল্যাটের ও গাড়ির কিস্তির টাকা দিতে হবে…তাই আমি চিত্রনাট্য লিখি…এখন একটি প্রস্তাব করবো তোমার কাছে।

: কী প্রস্তাব—শুনি ?

: তুমিই বলে দাও—কাজটি করবো কিনা…যদি বারণ কর—কাল সকালেই বাত্তিসতাকে জানিয়ে দেবো, প্রথম ষ্টীমারেই ক্যাপ্রি ছেড়ে চলে যাবো।

একটু ভেবে এমিলিয়া বলল, তুমি বড় ধূর্ত !

: কেন ?

: পরে অসুবিধা হলে যেন বলতে পার—দোষ আমারই।

: না না, কক্ষনো বলবো না···আমি নিজেই তো তোমার মত চাইছি।

আবার ভাবতে লাগলো এমিলিয়া।

তার উত্তরের উপরই নির্ভর করছে সব। অধৈর্য হয়ে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে।

এমিলিয়া বলল, এ সব ব্যাপারে অন্যের মতামত নেওয়া ঠিক নয়।

: কিন্তু আমি বলছি—

: তবে, আমি বলবো—একবার যখন কাজটি নিয়েছ, ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না।

: বেশ! পরে যেন বলো না—এ কাজে আমার আগ্রহ দেখেই বলেছ এ কথা। সত্যি বলছি, আমার এতটুকুও আগ্রহ নেই।

বিছানা ছেড়ে উঠে এমিলিয়া বলল : উঃ, আমায় ক্লান্ত করেছ তুমি··· এ তো আমার উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়···তুমি তোমার যা খুশি করতে পার ··আমার কোন আপত্তি নেই···তবু রেহাই দাও আমায়।

অবজ্ঞার সুর তার কথায়। যেদিন রোম-এ আমার মুখের উপর এমিলিয়া বলেছিল—আমায় সে ঘৃণা করে, সেদিন যে ব্যথা পেয়েছিলাম আজ তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেলাম। বললাম, আর কেন এমিলিয়া —আর কেন করছ এ সব?···কেন আমাদের এই বিরোধ?······

অন্যমনস্কভাবে সে উত্তর দিল, হয়তো—জীবনই এমনি······

স্তম্ভিত, স্তব্ধ হয়ে গেলাম এবার। এমনি করে, এমন গভীর ঔদাসীন্যের সঙ্গে সে তো কথা বলেনি আর কখনও! ইচ্ছা হলো বলি—আমি তাকে দেখেছি ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে, তার মতামত জানতে চেয়ে শুধু পরীক্ষা করছিলাম তাকে···আমাদের প্রশ্নের সমাধান হয়নি এখনও। কিন্তু বলা হলো না আসল কথাটি।

শঙ্কাভরে বললাম, যতদিন ক্যাপ্রিতে থাকবো ততদিন আমি তো চিত্র-নাট্য নিয়ে ব্যস্ত থাকবো···তুমি কী করবে তখন?

: বিশেষ কিছু নয়—বেড়াবো, সাঁতার কাটবো······রোদ-জলে স্নান করবো—সবাই যেমন করে!

: একা-একা?

: হ্যাঁ।

: একঘেয়ে লাগবে না?

: না, কিছুই আমার একঘেয়ে লাগে না কখনও······অনেক কিছু ভাববার আছে আমার।

: আমার কথা কখনও ভাব?

: ভাবি বৈকি!

এমিলিয়া হাতখানি টেনে নিয়ে বললাম, কী ভাব?

ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে সে বলল, অনেকবার বলেছি সে-কথা।

: এখনও ঠিক আগেকার মতোই ভাব?

এবার নিজের হাতখানি সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে এমিলিয়া বলল, দেখ······এবার ঘুমোও গে···আমি জানি, কতগুলো জিনিস পছন্দ কর না তুমি······তা স্বাভাবিকও······তাছাড়া, আগে যা বলেছি, আবার তা বলতে পারি······সে-সব বলে লাভ কী?

: কিন্তু আমি শুনতে চাই আবার।

: কেন?······আগে যা অনেকবার বলেছি, তা'ই তো বলবো আবার······ক্যাপ্রিতে এসেছি বলে আমার মত তো আর বদলে যায়নি।

: মানে?

: আমি বদলাই নি একটুও······আগের মতোই রয়েছি।

: আমার সম্বন্ধে তোমার এখনও সে-ভাবই রয়েছে, না ?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে এমিলিয়া বলল : বল তো, তুমি আমায় অমন জ্বালাতন কর কেন ?······তুমি কি মনে কর—তোমায় এসব কথা শুনিয়ে আনন্দ পাই আমি ?······তোমার চেয়ে আমিই বেশি অপছন্দ করি এ সব।

তার কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাস পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আবার তার হাত ধরে বললাম, আমি যে শুধু তোমারই কথা ভাবি··· চিরদিনই ভাববো—যা'ই ঘটুক না কেন······

শেষের কথাগুলো বলে বুঝতে চাইলাম—এমিলিয়ার সত্যিকারের বিশ্বাসঘাতকতাও ক্ষমা করেছি আমি।

উত্তর দিল না এমিলিয়া। সে যেন অপেক্ষা করে রইলো—আমি কখন বেরিয়ে আসবো।

উদাস ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে কৌশলে নিজের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো সে। অবস্থা বুঝে, তার কাছ থেকে রাত্রির জন্য বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তালায় চাবি লাগানোর শব্দ হলো।

তীব্রতর, নতুনতর হয়ে উঠলো আমার বেদনা !

ষোড়শ অধ্যায়

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এমিলিয়া ও বাত্তিসতার খোঁজ না করেই ঘর থেকে বেরোলাম ; না—পালালাম। সারারাত্রি বিশ্রামের পর অবিশ্বাস্য মনে হতে লাগলো—আগেকার দিনের ঘটনা ও আমার আচরণ। অসম্ভব—সবই অসম্ভব, মিথ্যা। এখন স্থিরভাবে চিন্তা

করা উচিত। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ফেলা উচিত হবে না।
ঘর ছাড়লাম তাই।

রেনগোল্ড-এর হোটেলে এসে জানলাম, তিনি বাগানে রয়েছেন। কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম—পথের শেষপ্রান্তে স্নিগ্ধ রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্র ও আকাশের বাধাহীন আলো-মাখা একটি অপ্রশস্ত প্রাচীরের সামনে কয়েকটি চেয়ার ও টেবিল সাজানো, টেবিলের উপর একটি পোর্টফলিও ও কাগজ কলম। সেদিকে যেতেই চেয়ার থেকে উঠে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন রেনগোল্ড। বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল তাঁকে। তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন, বলুন তো মিঃ মলটেনি, এমন সকাল কেমন লাগে আপনার?

: চমৎকার!

আমার হাত ধরে প্রাচীরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, এখন কাজ রেখে একবার নৌকোয় করে দ্বীপটা প্রদক্ষিণ করে এলে কেমন হয়? খুব ভালো লাগবে, না?

ভাবলাম, রেনগোল্ড-এর সঙ্গ তেমন আনন্দ-দায়ক হবে না। তাই বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললাম : হ্যাঁ, এক দিক থেকে হয়তো মন্দ হবে না। রেনগোল্ড বিজয়োল্লাসে বলে উঠলেন, ঠিক বলেছেন আপনি···কিন্তু কোন্ দিক থেকে? জীবন বলতে আমরা যা বুঝি, সেদিক থেকে নয়, নিশ্চয়······কারণ আমাদের কাছে জীবনের অর্থ হলো কর্তব্য···না? কর্তব্য আগে, সুতরাং কাজ করতে হবে।

প্রাচীরটা পেরিয়ে এসে আবার চেয়ারে বসলেন বাক্তিসত্তা। গম্ভীর ভাবে বললেন, আসুন, সামনে এসে বসুন····· আজই আমরা আলাপ-আলোচনা করবো······অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

মাথার টুপিটি চোখের উপর টেনে দিয়ে রেনগোল্ড বললেন, আপনার মনে আছে—নেপল্‌স্‌-এর পথে 'ওডিসি' সম্বন্ধে আমার নিজের অভিমত ও ব্যাখ্যা আপনাকে শোনাচ্ছিলাম—

: হ্যাঁ।

: এটাও হয়তো মনে আছে—'ওডিসি'র উৎস ও মূলগত ভাব সম্বন্ধে আপনাকে বলছিলাম······কিন্তু তখন বক্তব্য শেষ করতে পারিনি······ইউলিসিস তাঁর মনের অবচেতনায় অনিচ্ছা পোষণ করতেন, তাই বাড়ি ফিরতে দেরী করেছিলেন—সুদীর্ঘ দশটি বছর···

: হ্যাঁ।

: এবার আপনাকে বলবো—আমার মতে, কেন তিনি বাড়ি ফিরতে চাননি ?

একটু থেমে ভ্রূকুঞ্চিত করে আবার সুরু করলেন রেনগোল্ড : ইউলিসিস বাড়ি ফিরতে চাননি, কেন না স্ত্রী পেনিলোপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রীতিকর ছিল না······যুদ্ধযাত্রার আগে থেকেই মন কষাকষি ছিল······তা'ছাড়া, গৃহের অশান্তিই ছিল তাঁর যুদ্ধযাত্রার কারণ······স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মধুর ছিল না বলেই পারিবারিক জীবনে সুখী ছিলেন না ইউলিসিস।

দু'চোখ মেলে চেয়ে রইলাম।

রেনগোল্ড বলতে লাগলেন : পেনিলোপের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যদি প্রীতিকর হ'তো, তা'হলে ইউলিসিস দূর দেশে পাড়ি দিতেন না ······দর্পী বা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিলেন না তিনি······তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, জ্ঞানী ও সাবধানী···পত্নীর সঙ্গে সদ্ভাব থাকলে শুধু বীরত্ব খ্যাতি অর্জনের জন্য তিনি ঘর ছাড়তেন না······যুদ্ধের সুযোগে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পালিয়েছিলেন।······

: আপনার উক্তি যুক্তিপূর্ণ বটে!

আমার উক্তির মধ্যে শ্লেষ লক্ষ্য করেই যেন তিনি বললেন : তা'হলে স্বীকার করছেন—গভীর মনস্তত্ত্বমূলক······সত্যিই তাই······তবে মনে রাখবেন, মনস্তত্ত্বের উপরই নির্ভর করছে সব······মনস্তত্ত্ব ছাড়া কোন চরিত্র হয় না, চরিত্র ছাড়া গল্প হয় না······ইউলিসিস পেনিলোপের মনস্তত্ত্বটা কী? সেটা হলো : পেনিলোপ হচ্ছেন—প্রাচীন রাজতান্ত্রিক, অভিজাত গ্রীসের পরম্পরাগত নারী·· তিনি ধর্মপরায়ণা, মহিমময়ী, গর্বিতা, সুগৃহিণী, জননী ও জায়া······আর, ইউলিসিসের চরিত্র হচ্ছে পরবর্তী যুগের—সুফী ও দার্শনিক মতবাদী গ্রীসের জনসাধারণের চরিত্রের পূর্ব রূপায়ণ······ইউলিসিস সংস্কারমুক্ত, সুচতুর, কণ্ঠাহীন, যুক্তিপরায়ণ, বুদ্ধিমান, নাস্তিক, সন্দেহবাদী—কখনও বা মানবদ্বেষীও।

বাধা দিয়ে বললাম, আমার মনে হয়—আপনি ইউলিসিসের চরিত্র কলঙ্কিত করছেন····· 'ওডিসি'তে—

: 'ওডিসি' সম্বন্ধে আমরা একটুও মাথা ঘামাতে চাই না···চাই —'ওডিসি'র মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করতে, 'ওডিসি'কে সম্প্রসারিত করতে··· আমরা চিত্র নির্মাণ করতে যাচ্ছি ···'ওডিসি' রচিত হয়ে গেছে—কিন্তু আমাদের ফিল্ম এখনও আরম্ভ হয়নি।······

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রেনগোল্ড বললেন: ইউলিসিস পেনিলোপের মধ্যে বিরোধের কারণ হলো—দু'জনের চারিত্রিক অসঙ্গতি···ট্রয়-যুদ্ধের আগেই ইউলিসিস এমন একটা কিছু করেছিলেন, যার জন্য পেনিলোপ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তাঁর উপর·····তবে, কী করেছিলেন, জানি না···এখানেই আসে পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীরা ······'ওডিসি'তে দেখতে পাই—প্রার্থীরা ইউলিসিসের গৃহেই স্বচ্ছন্দে বাস করছে···এই পরিবেশটা বদলে দিতে হবে······

হাঁ করে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

রেনগোল্ড প্রশ্ন করলেন: বুঝলেন? শুনুন, আরও পরিষ্কার করে বলছি······পেনিলোপের পাণিপ্রার্থীরা ট্রয়-যুদ্ধের আগে থেকেই তাঁর প্রণয়াসক্ত······গ্রীসের প্রচলিত রীতি অনুসারে তারা পেনিলোপের কাছে উপহার পাঠায়······গর্বদৃপ্তা ও মর্যাদাভিমানিনী পেনিলোপ তাদের উপহার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে চান···তাঁর ইচ্ছা—স্বামী এই অবাঞ্ছিত প্রার্থীদের দূর করে দেন······কিন্তু কোন কারণে এ ব্যাপারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না ইউলিসিস······যুক্তিবান তিনি, তিনি জানেন—পেনিলোপ তাঁর অনুগতা······তাই প্রার্থীদের আমলই দেন না, সে-সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন না—তা' নিয়ে কোন ঝামেলা সৃষ্টি করতে চান না···শান্তিময় জীবনের পক্ষপাতী তিনি···কলঙ্ককে তাঁর চিরদিনই ভয়······ইউলিসিসের এই নিষ্ক্রিয়তায় বিরক্ত হয়ে ওঠেন পেনিলোপ, অবিশ্বাস জাগে তাঁর মনে······তিনি প্রতিবাদ করেন, বিদ্রোহী হন; কিন্তু ইউলিসিস অবিচল নিষ্ক্রিয়, পাণিপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন যুক্তিই খুঁজে পান না····· পেনিলোপকে উপদেশ দেন—উপহার নাও, ভদ্র ব্যবহার কর তাদের সঙ্গে······ক্ষতি কী তা'তে?···স্বামীর আদেশ পালন করেন পেনিলোপ, কিন্তু তাঁর মনের বিদ্বেষ ধূমায়িত হ'তে থাকে······ভাবেন, আর স্বামীকে ভালবাসতে পারবেন না; শুধু তা' নয়—তাঁকে জানান এ কথা ····তখনই ইউলিসিস অনুভব করেন—নিজের অপরিণামদর্শিতায় পেনিলোপের ভালবাসা হারিয়েছেন······প্রতীকার করতে চান, ফিরে পেতে চান নিজের স্ত্রীকে, কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়······বিষময় হয়ে ওঠে তাঁর জীবন······ইথাকায় বাস করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে তাঁর পক্ষে······ অবশেষে ট্রয়-যুদ্ধের সুযোগে তিনি গৃহত্যাগ করেন······সাত বছর

পরে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়····· সমুদ্রপথে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন ইউলিসিস······কিন্তু তিনি জানেন—স্ত্রী তাঁকে ভালবাসে না······তাই অজ্ঞাতসারে ফিরে না যাবার অজুহাত খুঁজতে থাকেন······তবু, একদিন ফিরতে হলো তাঁকে······তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর পেনিলোপ প্রমাণ করলেন—তিনি পতিপরায়ণা, জানালেন—স্বামীর প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রেম নয়—ধর্ম······বললেন, তিনি আবার ভালবাসবেন তাঁর স্বামীকে, কিন্তু এক শর্তে : পানিপ্রার্থীদের হত্যা করতে হবে······আমরা জানি, হিংস্র, রক্তপিপাসু নন ইউলিসিস ······তাঁর মনে প্রতিহিংসা-তৃষা নেই······শান্তির মধ্য দিয়ে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে পারলেই খুশি হতেন তিনি······কিন্তু এবার বুঝলেন, পাণিপ্রার্থীদের হত্যার উপরই নির্ভর করছে—পেনিলোপের শ্রদ্ধা ও প্রেম ······মন স্থির করে ফেললেন ইউলিসিস······প্রার্থীদের হত্যা করলেন ······পেনিলোপ আর ঘৃণা করলেন না তাঁকে, জানালেন তাঁর অকৃত্রিম প্রেম······তারপর দীর্ঘ বিরহের পর সাধিত হলো ইউলিসিস পেনিলোপ-এর প্রণয়-মধুর মিলন······তাঁরা তাঁদের শুভ-পরিণয় উৎসব সম্পন্ন করলেন, অনুষ্ঠিত হলো তাঁদের সত্যিকারের শোণিত-পরিণয়··· এবার বুঝলেন, মিঃ মলটেনি?······এক কথায়—ইউলিসিস মানুষের মতো, রাজার মতো আচরণ করেননি বলেই পেনিলোপ তাঁকে ঘৃণা করেছিলেন······সেই ঘৃণা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ট্রয়-যুদ্ধে··· ···পত্নীর প্রেম-নির্ঝরিণী যেখানে শুকিয়ে গেছে, সেই গৃহে ফিরে আসতে চাননি ইউলিসিস, আর—পেনিলোপের শ্রদ্ধা ও প্রেমের জন্যই তিনি নির্মম হত্যাকার্য্যে লিপ্ত হয়েছিলেন অবশেষে······ বুঝলেন তো?

বললাম, হ্যাঁ, বুঝেছি।

মনের পুঞ্জীকৃত ঘৃণা তীব্রতর হ'লো—এ ব্যাখ্যা শুনে।

রেনগোল্ড বললেন: জানেন, এমন পরিবেশ আমি কল্পনা করলাম কেমন করে?……'ওডিসি'তে পাণিপ্রার্থীদের হত্যাকাণ্ড দেখে…ইচ্ছা করলে এই হত্যাকাণ্ড না করেও পারতেন ইউলিসিস……কিন্তু করলেন কেন?……তাঁর নিষ্ঠুর আচরণের দ্বারা প্রমাণ করলেন—তিনি শুধু শঠ, নমনীয় ও বিচক্ষণ নন, প্রয়োজন হলে হিংস্র যুক্তিহীন হৃদয়হীনও হতে পারেন……কার কাছে প্রমাণ করলেন?……কেন, পেনিলোপের কাছে—হ্যাঁ, পেনিলোপের কাছে……ইউরেকা! ইউরেকা!

চুপ করে রইলাম। রেনগোল্ড-এর যুক্তি চমৎকার—'ওডিসিকে' মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনীতে রূপান্তরিত করার আকাঙ্ক্ষারই অনুরূপ। শুধু এ কারণেই আমার মনে জেগে উঠলো বিদ্বেষ ভাব—যেন কলুষিত হয়েছে আমার অন্তর। হোমরের মধ্যে সবই সরল, সহজ, পবিত্র ও মহান্। মননশীলতার উৎকর্ষের গণ্ডীর মধ্যে সবই রয়েছে অপূর্ব কাব্যময় হয়ে। কিন্তু রেনগোল্ড-এর ব্যাখ্যায় সব নেমে এসেছে আধুনিক নাটকের পর্যায়ে, নীতি ও মনস্তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে অকারণে।

এবার উপসংহার করলেন রেনগোল্ড: দেখলেন তো মলটেনি, চিত্র রয়েছে পুরোপুরি……শুধু রেখায় ফুটিয়ে তুললেই হলো।

বললাম, আপনার ব্যাখ্যা সমর্থন করতে পারছি না।

বিস্ময়ে চোখ দু'টি কপালে তুলে রেনগোল্ড বললেন, সমর্থন করেন না! কেন?

: কারণ, আপনার ব্যাখ্যায় ইউলিসিসের মূল চরিত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে……একটি আদর্শ পুরুষকে অতি সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন আপনি।

রেনগোল্ডের ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কর্কশ কণ্ঠে তিনি বললেন, দেখুন মিঃ মলটেনি, আপনি কিছু বোঝেন নি—বুঝবেনও না।

: মানে ?

: তবে শুনুন—কেন একথা বললাম। আপনি যেমন মনে করছেন, ইউলিসিসকে ঠিক তেমনি মর্যাদাহীন শিষ্টাচারহীন করে দেখাতে চাই না আমি…'ওডিসি'তে তাঁকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে ঠিক সে-ভাবেই দেখাতে চাই……'ওডিসি'তে ইউলিসিস কে ?……তিনি হলেন —মার্জিত-রুচি পুরুষ, সভ্যতার প্রতীক…তাঁর সভ্যতা কোথায় ? ইউলিসিসের সভ্যতার প্রমাণ—তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত আচরণ—মর্যাদা ও সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিমত্তা, বস্তুতান্ত্রিকতা ·····কিন্তু সভ্যতার অসুবিধাও রয়েছে……পেনিলোপ সুশিক্ষিতা নন, তিনি হচ্ছেন পরম্পরাগত নারী……তিনি যুক্তি জানেন না… প্রেরণা, শোণিত, গর্ব —এই তাঁর সব……সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'ওডিসি'তে পেনিলোপ হচ্ছেন বর্বরতা আর ইউলিসিস সভ্যতার প্রতিমূর্তি……ভেবেছিলাম, আপনিও ইউলিসিসের মতো সুসভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন…কিন্তু দেখছি—আপনি তর্ক করছেন অমার্জিত-রুচি পেনিলোপের মতো…

আত্ম-তৃপ্তির হাসি হাসলেন রেনগোল্ড।

বিস্বাদ মনে হলো তাঁর এই তুলনা। রাগে বিবর্ণ হলো আমার মুখখানি। কম্পিতকণ্ঠে বললাম, যদি মনে করে থাকেন—সভ্যতা ও সংস্কৃতির অর্থ এই যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রণয়ীকে পোষণ করবে, তবে আমি অমার্জিত থাকতেই প্রস্তুত, মিঃ রেনগোল্ড।……

আশ্চর্য ! এবারও রাগ করলেন না রেনগোল্ড। হাত তুলে বললেন, আহ্ হা, আপনি দেখছি যুক্তির ধার ধারছেন না আজ……

পেনিলোপের মতোই অযৌক্তিক মনে হচ্ছে আপনার কথাগুলো……এক কাজ করুন—বাড়ি গিয়ে স্থির মনে আবার ভেবে দেখুন……কাল সকালে চিন্তার ফলাফল জানাবেন…কেমন ?

: বেশ !

রেনগোল্ড উঠলেন, আমিও উঠলাম।

গম্ভীরভাবে রেনগোল্ড বললেন, আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই যে একটু চিন্তা করলেই আপনি আমার সঙ্গে এক মত হতে পারবেন।

: মনে হয় না।

হোটেলের পথ ধরে অগ্রসর হ'তে লাগলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রায় ঘণ্টা খানেক ছিলাম রেনগোল্ডের সঙ্গে। সুতরাং তাঁর ব্যাখ্যা মানবো কিনা—'আবার ভেবে দেখার' সময় আছে যথেষ্ট। কিন্তু বাইরে এসে তাঁর কথা ভাববার প্রবৃত্তি হলো না। ইচ্ছা হলো—একাগ্রচিত্তে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করি। রেনগোল্ড-এর কল্পনা চিত্র-নির্মাণের গণ্ডী ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে। তিনি বলেছেন—অব্যক্ত, অবর্ণনীয় একটা কিছু। আমাকে আবার ভেবে দেখতে হবে তাই।

সকালে ঘর থেকে বেরোবার সময় দেখেছি ছোট্ট একটি নির্জন যায়গা—বাত্তিসতার ঘরের ঠিক নিচে। ঠিক্ করলাম সেখানেই যাবো। সেখানে বসে ভেবে দেখতে পারবো, আর যদি না পারি—ইচ্ছা করলে সাঁতার কাটতে পারবো।

তখনও সকাল। পথে দু'একটি ছেলে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, কয়েকটি ছোট্ট মেয়ে হাত ধরে চলেছে আনন্দ-কলরবে চারদিক মুখর করে, ক'জন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কুকুর সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

ছায়াঘেরা জন-বিরল পথ। যে-পথ দিয়ে গিয়েছিলাম সে-পথ ধরেই এলাম। যে রাস্তাটি দ্বীপকে বেষ্টন করে রয়েছে সেটি পেরিয়ে পড়লাম একটি সরু গলিতে। গলি বেয়ে এসে আর একটি নতুন রাস্তা পেলাম। রাস্তাটি চলেছে গ্রীষ্মাবাসের দিকে। অবশেষে সে-পথই ধরলাম।

গ্রীষ্মাবাসে এসে নিচের দিকে তাকালাম। তিনশো ফিট নিচে সমুদ্র কাঁপছে, ঝলমল করছে সূর্যালোকে, রঙ বদলাচ্ছে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—কোথাও নীল, কোথাও সবুজ জল—দূরে, অনেক দূরে। এই দূর, নিথর সমুদ্রের ভিতর থেকে দ্বীপের সম-বিলম্বিত পাহাড়গুলি যেন ডানা মেলে উড়ে আসছে আমার দিকে, তীরের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উপরের দিকে উঠছে। তাদের উন্নত, উন্মুক্ত শিরে সোনালি আলোর প্লাবন।

…অতর্কিতে আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো মনে, আলোর এই প্রাচুর্যের মধ্যে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে থাকবার ইচ্ছা হলো। জীবনে যে পবিত্রতা রক্ষা করতে পারিনি মরণেই তা' অর্জন করতে হবে। মৃত্যুই আমার পরম শান্তি, একমাত্র কাম্য।

উন্মাদ হয়ে উঠলাম আত্মহত্যার এই প্রলোভনে। ক্ষণিকের জন্য বিপন্ন হলো আমার জীবন। মনে পড়লো এমিলিয়ার কথা। ভাবলাম—আমার মৃত্যু সংবাদ কেমন করে গ্রহণ করবে সে? নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললাম: জীবনে ক্লান্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে চাও না তুমি, আত্মঘাতী হ'তে চাও এমিলিয়ারই জন্য।……

বিচলিত হলাম। বিতৃষ্ণার ভাব কেটে গেল।

: কেন তুমি মরতে চাও? এমিলিয়ারই জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে চাও, না এমিলিয়াই তোমার জীবনের উপর এই বীতরাগের কারণ?

: আমি মরতে চাই—মৃত্যুর পরে হলেও এমিলিয়ার শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য……সে আমায় অন্যায়ভাবে ঘৃণা করে, তাই তাকে অনুতপ্ত করতে চাই……

একথা মনে হতেই যেন সম্পূর্ণ হয়ে উঠলো আমার বর্তমান অবস্থার চিত্রটি।

: তোমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া স্থরু হয়েছে কেন?

: তার কারণ—ইউলিসিস-পেনিলোপের সম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে রেনগোল্ড অজ্ঞাতসারে তোমার ও এমিলিয়ার সম্পর্কেরই কথা বলেছেন। ইউলিসিসের প্রতি পেনিলোপের অবজ্ঞার কথা তিনি যখন বলেছিলেন তখন তোমার মনে পড়েছে এমিলিয়ার কথা। তুমি ব্যথা পেয়েছ তাতে, তাই প্রতিবাদ করেছ তাঁর কথায়। ভুল করেছ তুমি। এখনও বুঝতে পারনি—এমিলিয়ার শ্রদ্ধা অর্জন করতে হলে আত্মহত্যার প্রয়োজন নেই। পেনিলোপের ভালবাসা ফিরে পাওয়ার জন্য ইউলিসিস প্রণয়ীদের হত্যা করেছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাত্তিসতাকে হত্যা করাই তোমার উচিত। কিন্তু বর্তমান যুগের সঙ্গে 'ওডিসি'র যুগের তুলনা চলে না। আমরা বাস করি—আলাদা পৃথিবীতে। আমরা চাই শান্তি।……এখন তোমার কর্তব্য হবে—রেনগোল্ড-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কাল সকালেই রোম-এ ফিরে যাওয়া। এমিলিয়ার উপদেশ তুমি শুনবে না। কাজ করবে—বীর ইউলিসিসের মতো ……

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক! সত্যিই তো!

আদ্যোপান্ত আলোচনা করে দেখলাম। না, আর ভেবে কাজ নেই। এখনই রেনগোল্ডকে জানিয়ে দেবো—আমার অভিপ্রায়।...... তবে হ্যাঁ,—অত তাড়াহুড়ো কিসের? বিকেলে জানালেই চলবে। বাড়ি ফিরে এমিলিয়াকে বলবো, জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও। বাত্তিসতাকে কিছু বলবো না। সকালেই চলে যাবো এমিলিয়াকে নিয়ে। যাবার আগে কাগজে লিখে যাবো—আমার মতের সঙ্গে রেনগোল্ড এর মত মিলছে না। বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা না করাই ভালো। তিনি ধূর্ত, সব বুঝে ফেলবেন......

ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। একটি সরু গলি পেরিয়ে বাগানবাড়ির নিচে এলাম। খাড়া পথটি ধরে নিচের দিকে নেমে হাঁপাতে লাগলাম পরিশ্রমে। পাথরের উপর দাঁড়িয়ে দম নিতে হলো।

সমুদ্রতীরে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে বড় বড় পাথর। পাথরগুলি যেন একটু আগেই নিচে গড়িয়ে পড়েছে। দু'টি শিলাময় অন্তরীপ চলেছে স্বচ্ছ জলের সীমানা পেরিয়ে, সূর্যালোকে জলের তলে শাদা নুড়িগুলি দেখা যাচ্ছে। তারপর চোখে পড়লো—মরচে পড়া, ফাটল ধরা, বালি ও জলে আধো ডোবা একখণ্ড কালো পাথর। ঐ পাথরের পেছনে গিয়ে শুয়ে পড়বো।

পাথরটির পেছনে গিয়ে দেখলাম—সেখানে শুয়ে রয়েছে এমিলিয়া, তার সর্বাঙ্গ অনাবৃত।......

প্রথমটা চিনতেই পারলাম না এমিলিয়াকে। তার মুখখানি একটি খড়ের টুপি দিয়ে ঢাকা। একবার ইচ্ছা হলো নিঃশব্দে ফিরে যাই। হয়তো কোন্ অপরিচিতা স্নানার্থিনীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। তারপর দৃষ্টি পড়লো—নুড়ির উপর ছড়ানো বাহু দুটির উপর। দেখলাম, তার

হাতে রয়েছে—একটি সোনার আংটি। কিছুদিন আগে পরিণয়-উপহার হিসাবে আংটিটি দিয়েছিলাম এমিলিয়াকে। দাঁড়িয়েছিলাম তার ঠিক পেছনেই। জামা-কাপড় খুলে অদূরে রেখেছে এমিলিয়া। বিশাল দেখাচ্ছে তার নগ্ন দেহখানি। বক্ষ, উরু, নিতম্ব ও কোমর—সবই অস্বাভাবিক। মনে হলো—আকাশ ও সমুদ্রের অসীমতার ছায়া পড়েছে তার দেহে।······কিন্তু কেন এমন মনে হচ্ছে? এই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে আমার দেহের কামনা থেকেই যেন জেগেছে এ ভাব। এমিলিয়ার সঙ্গে দৈহিক মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হলো। কিন্তু তা যে নির্ভর করছে তার সম্মতির উপর। না, না—সে রাজী হবে না। এ যেন আমারই ভুল!

স্পষ্ট কণ্ঠে ডাকলাম, এমিলিয়া!

চমকে উঠলো সে, ধড়মড় করে উঠে বসলো গুটিসুটি হয়ে। পেছন ফিরে তাকাল না, জামাটি নেবার জন্য হাত বাড়ালো।

বললাম, ভয় নেই, আমি—রিকার্ডো।

সে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখলো আমায়, লজ্জা নিবারণের জন্য ব্যস্ততা দেখালো না আর।

বললাম, প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে তোমায় দেখছিলাম······মনে হচ্ছিল যেন আজ প্রথম দেখছি······

কিছু বলল না এমিলিয়া। নীরবে এগিয়ে এলো একটু—যেন আমায় ভালো করে দেখে নিল একবার। সে হয়তো ভেবেছিল অপরিচিত কেউ এসেছে। আমাকে দেখে ভয় কেটে গেছে তার।

বললাম, আমি এখানে থাকবো, না চলে যাবো?

একটু চিন্তা করলো এমিলিয়া। তারপর শান্তভাবে রোদে গা এলিয়ে দিল। বলল, ইচ্ছে হয় থাকতে পার—তবে, রোদটা আড়াল করো না যেন।

তা'হলে, সত্যিই সে মনে করে—অস্তিত্ব নেই আমার, আমি শুধু একটি ছায়াময় দেহ—যাকে উজ্জ্বল সূর্য ও এমিলিয়ার নগ্ন দেহের মাঝখানে নির্ভয়ে রাখা যায়, যদিও আমার দৈহিক উত্তেজনার সঙ্গে তাল রেখে তার দেহেও উত্তেজনা জাগার কথা।

ব্যথিত, বিচলিত হ'লাম তার ঔদাসীন্যে। আশঙ্কায় শুকিয়ে গেল মুখখানি।

বললাম, যায়গাটি চমৎকার···আমিও সূর্য-স্নান করবো।

অদূরে একটি পাথরের স্তূপে হেলান দিয়ে বসলাম।

দু'জনেই নীরব। সোনালি আলোর অবারিত অনন্ত স্রোত ঘিরে ফেললো আমায়। কল্যাণ ও শান্তির অনুভূতিতে দু'টি চোখ বুজে এলো। শুধু কি রোদ পোহাবার জন্যই এসেছি এখানে? যদি এমিলিয়া আমায় ভাল না বাসে, তা'হলে রৌদ্র-উপভোগের আনন্দ পাবো না।

বললাম, মনে হয়—বিশেষ করে প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যই এই যায়গাটি তৈরী।

এমিলিয়া বলল, হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

: তবে—আমাদের জন্য নয়,—আমাদের মধ্যে তো প্রেম নেই আর।

কিছু বলল না এমিলিয়া।

তার দিকে চেয়ে রইলাম। পাথরের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসে তাকে দেখে যে কামনা জেগেছিল, আবার তা' প্রবল হয়ে উঠলো।

গভীর আবেগের ধর্মই হলো এই যে আবেগ-চালিত হয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে বসি। দেখলাম—কেমন করে জানি না, এমিলিয়ার কাছে এসে পড়েছি, তারই পাশে বসে আছি, আমার মুখটি তার মুখের কাছে, নিশ্চল নিদ্রামগ্ন সে। থাবার

মুখে দেবার আগে ক্ষুধিত যেমন আহার্যের দিকে চায়, তেমনি আকুল লোলুপ দৃষ্টিতে দেখছি এমিলিয়ার মুখ। চুমো খাবো তাকে। কত দিন চুমো খাইনি ও-মুখে! আধ-নিদ্রা ও আধ-জাগরণে সে যদি চুমো ফিরিয়ে দেয়, তবেই তার স্বাদ ও গন্ধ হবে পুরনো কড়া সুরার মতো। হয়তো মুহূর্তেক চেয়েছিলাম ওই মুখের দিকে। ধীরে ধীরে ঠোঁট আনলাম এমিলিয়ার ঠোঁটের কাছে। কিন্তু চুমো খেলাম না, স্তব্ধ হয়ে রইলাম ক্ষণকাল। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম মৃদু নিঃশ্বাস ও তপ্ত ঠোঁটের উষ্ণতা। জানতাম, ঐ দু'টি ঠোঁটের নিচে এমিলিয়ার মুখের ভিতরে রয়েছে লালার স্নিগ্ধতা—রৌদ্র-দগ্ধ মাটির ফাটলের নিচে সঞ্চিত বরফের মতো। সেই স্বাদের কথা ভাবতে ভাবতে এমিলিয়ার ঠোঁটের সঙ্গে মিলালাম আমার ঠোঁট। সেই স্পর্শে জেগে উঠলো না এমিলিয়া, এতটুকু বিস্ময় দেখাল না। আবার ঠোঁটে ঠোঁট লাগালাম, মৃদু চাপ দিলাম, আর একটু জোরে চাপলাম। তবু সে নিশ্চল, স্থির। একটি নিবিড় চুম্বন এঁকে দিলাম তাই। সে মুখ খুললো ধীরে ধীরে, তার দাঁতের মাড়ির উপর এলো আমার ঠোঁট দুটি, অনুভব করলাম—একটি কোমল বাহু আমার কণ্ঠ বেষ্টন করলো।......

হঠাৎ একটি তীব্র ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠলাম সমাধি থেকে। আমার সামনে ঠিক তেমনি ভাবেই শুয়ে রয়েছে এমিলিয়া, তার মুখ খড়ের টুপিতে ঢাকা।

বুঝলাম, স্বপ্ন দেখেছি সেই চুম্বনের। হয়তো-বা উন্মত্ত-আকাঙ্ক্ষায় অবান্তর, আকর্ষণীয় মোহে চুম্বনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি...... আমি চুমো খেয়েছি—সে ফিরিয়ে দিয়েছে সেই চুম্বন। কিন্তু যে চুমো খেয়েছে, আর যে চুমো ফিরিয়ে দিয়েছে—তারা দু'জনেই যে আমার আকাঙ্ক্ষায় গড়া স্বপ্ন-প্রতিমা—আমি ও এমিলিয়া নই!

এমিলিয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবলাম, এখন যদি তাকে সত্যিই চুমো খেতে চাই ?······মনে মনে বললাম······না। তবে কি পঙ্গু হয়ে পড়েছি আমি ?···আমার উপর এমিলিয়ার ঘৃণার কথা ভেবে অবশ হয়ে পড়লাম কী ?···

অস্ফুট স্বরে ডাকলাম, এমিলিয়া !

: কী ?

: ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছিলাম—তোমায় চুমো খাচ্ছি।

নীরব রইল এমিলিয়া। শঙ্কিত হলাম তার মৌনতায়। প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করলাম তাই। প্রশ্ন করলাম, বাত্তিসতা কোথায় ?

শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল এমিলিয়া, জানি না···তবে হ্যাঁ, উনি আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন না, রেনগোল্ড-এর সঙ্গে খাবেন।

হঠাৎ বলে ফেললাম, দেখ এমিলিয়া, কাল সন্ধ্যায় দেখলাম বাত্তিসতা তোমায় আদর করছেন।

স্বাভাবিক ভাবে সে বলল, জানি—তুমি দেখেছ······আমিও দেখেছি তোমায়।

এমিলিয়ার কথা শুনে বিচলিত হলাম, একটু বিব্রতও বোধ করলাম। ভেবেছিলাম—স্তব্ধ সূর্যালোকে ও সমুদ্রের নীরবতায় ঘুচে গেছে আমাদের বিরোধ, দাম্পত্য-কলহ স্বাভাবিক দম্ভ ও ঔদাসীন্যের স্তরে এসে পৌঁছেছে। তবু, অতি কষ্টে বললাম, তোমার সঙ্গে একটি কথা আছে, এমিলিয়া।

: এখন নয়······আমি একটু রোদে থাকবো কতক্ষণ।

: তবে, বিকেলে—

: বেশ।

পেছন না ফিরেই বাগান বাড়ির পথ ধরে চলতে লাগলাম।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কোন কথাই হলো না লাঞ্চের সময়।

মধ্যাহ্নের দীপ্ত আলো যেন বাগানবাড়ির ভিতরে এনেছে অখণ্ড মৌনতা। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশ ও সমুদ্র। এমিলিয়া ও আমার মধ্যে যেন সৃষ্টি হয়েছে অনন্ত ব্যবধান। এই সীমাহীন নীলিমা যেন সমুদ্রের গভীরতার মতো একটি তরল পদার্থ। দু'জনে বসে আছি সমুদ্রের তলদেশে, উজ্জ্বল গতিশীল তরল পদার্থটি রয়েছে আমাদের মাঝখানে, নির্বাক হয়েছি আমরা।···ঠিক করেছি, বিকেলের আগে এমিলিয়াকে কিছু বলবো না। মুখোমুখি বসে আছি, অথচ একটি জরুরী আলোচনা মুলতুবী রেখেছি। বাস্তিসতার চুম্বন কিংবা আমাদের সম্পর্কের কথা চিন্তাই করলাম না। এমিলিয়াও সে-কথা ভাবলো না নিশ্চয়। সমুদ্র-সৈকতে যে সানন্দ কৌতুহল, জড়তা ও ঔদাসীন্যে চুপ করে ছিলাম, এখনও রয়েছে ঠিক সে-ভাব।

লাঞ্চের শেষে এমিলিয়া বলল, এবার একটু বিশ্রাম করতে যাচ্ছি।

বেরিয়ে গেল এমিলিয়া।

একা বসে বসে কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে চেয়ে রইলাম—স্বচ্ছ, আলো-উদ্ভাসিত দিগন্তের পানে—যেখানে সমুদ্রের নীলের সঙ্গে হয়েছে আকাশের গাঢ় নীলিমার মিলন।···একটি কালো জাহাজ সীমারেখা ধরে অগ্রসর হচ্ছে—যেন একটি মাছি হাঁটছে সুতোর উপর। ছোট্ট জাহাজটি—একটি কালো দাগ যেন। কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যাবে—জাহাজটি আসলে ছোট নয়। সেখানে রয়েছে সজীব মানুষ ও মানুষের ভাগ্য। যাত্রীরা যেন ক্যাপ্রির উপকূলের দিকে চেয়ে

আছে। তারা উপকূলে দেখতে পাবে—একটি শাদা দাগ, বুঝতে পারবে না—এটি বাত্তিসতার বাগান বাড়ি, এখানে রয়েছি আমি, একটু আগেই এমিলিয়া ছিল আমার কাছে, আমাদের মধ্যে প্রেম নেই, এমিলিয়া আমায় ঘৃণা করে, আর—আমি জানি না, কেমন করে ফিরে পাবো তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

তন্দ্রা এলো। ভাবলাম, রেনগোল্ডকে জানিয়ে দিয়ে আসবো আমার সংকল্পের কথা। হঠাৎ কে যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল আমার গায়ের উপর। তন্দ্রার ভাব কেটে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

আধ ঘণ্টা লাগলো রেনগোল্ড-এর হোটেলে আসতে।

হল-এ ঢুকে খবর পাঠালাম তাঁর কাছে। চঞ্চল হলেও যেন বেশ পরিষ্কার হয়েছে মন। স্বস্তি বোধ করলাম, আনন্দও হলো। হয়তো ঠিক পথেই চলছি এবার।

আমায় দেখে অবাক হয়ে গেলেন রেনগোল্ড—অশুভ সংবাদের আশঙ্কায় ব্যাকুলও হলেন যেন।

বললাম, মাফ্ করবেন……আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম……ঘুমিয়েছিলেন বোধ হয়?

: না না, দিনের বেলা ঘুমোই না আমি……আসুন না এদিকে…“বার”-এ গিয়ে বসা যাক।

“বার”-এ ঢুকলাম। আর কেউ নেই এখানে।

রেনগোল্ড বললেন, কিছু খাবেন তো?

: না, কিছু দরকার নেই।……

এত শিগগির আপনার কাছে ফিরে এলাম বলে নিশ্চয় অবাক হয়েছেন আপনি……একটি দিন ভেবে দেখতে পারতাম……কিন্তু মনে

হলো—কাল অবধি অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই……অনেক ভেবেছি এ-সম্বন্ধে…আপনাকে আমার চিন্তার ফলাফল জানাতে এলাম……

: বলুন।

: এই চিত্রনাট্য লিখতে পারবো না……চাকরী ছেড়ে দেবো।

রেনগোল্ডও তাই আশা করছিলেন নিঃসন্দেহে। বিস্মিত বা বিচলিত দেখালো না তাঁকে। বললেন, আমাদের মধ্যে আন্তরিক ও সুস্পষ্ট আলাপ হওয়া দরকার।

: আমার মনে হয়, আন্তরিকতার সঙ্গেই বলছি—'ওডিসি' চিত্রনাট্য লিখবো না আমি।

: কিন্তু—কেন দয়া করে বলুন!

: কারণ—আপনি যে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা আমার মনঃপূত হয়নি।

: আপনি তা'হলে বাত্তিসতার সঙ্গেই এক মত?

বিরক্তি বোধ করলাম এই অপ্রত্যাশিত অভিযোগে। রুষ্ট ভাবে বললাম, এর সঙ্গে বাত্তিসতার সম্পর্ক কোথায়?……আপনাকে তো বলেছি, তাঁর সঙ্গেও আমি একমত নই…তবু, বাত্তিসতার আইডিয়াটা আপনার চেয়ে ভালো…যা হোক্, আমি এ-কাজ করতে পারছি না… তাই আমি দুঃখিত…তবে বলবো, ছবি যদি করতেই হয়—হোমরের 'ওডিসিটা'ই করা উচিত, নইলে ছবি তোলার কোন মানেই হয় না…

……নগ্ন নারী, কিং কঙ, অশ্লীল নৃত্য, দৈত্য-দানব আর ছদ্মবেশধারীদের নিয়ে একটি রঙীন ছায়াচিত্র—

: তা' বলিনি আমি…বলেছি—হোমরের 'ওডিসি'।

তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে রেনগোল্ড বললেন, আমি যে 'ওডিসি'র কথা বলেছি সেটিই হলো হোমরের 'ওডিসি'।

: না। আপনি আমাকে বলতে বাধ্য করছেন—আপনার 'ওডিসি' হোমরের 'ওডিসি' নয়····· হোমরের 'ওডিসি' আমায় মুগ্ধ করে, আপনার 'ওডিসি' বিরক্তি আনে।

: মলটেনি !

উত্তেজিত দেখালো রেনগোল্ডকে। আমিও উত্তেজিত হয়ে বললাম: এ অসহ্য······হোমর যেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে চিত্র-রূপায়ণের অক্ষমতার জন্য হোমরের নায়ককে হীন প্রতিপন্ন করার এই সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা আমার কাছে বিরক্তিকর ······আমি কিছুতেই সে-কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারি না···প্রসারতা নেই আপনার পরিকল্পনায়····· এবার বুঝলেন তো, কেন এই চিত্রনাট্য রচনা করতে চাই না ?

ঘর্মাক্ত হ'লো আমার সর্বাঙ্গ। রেনগোল্ড আমার দিকে কটাক্ষপাত করে বললেন: আপনি যে বাত্তিসতার সঙ্গে এক মত—একথা তিনি আজ লাঞ্চের সময় আমায় জানিয়েছেন······আমার মতের সঙ্গে আপনার মতের মিল হবে কেন ?······শিল্প আপনার কাছে বড় নয়···আপনি চান শুধু অর্থ···যে-কোন উপায়ে টাকা পেলেই হ'লো।

গর্জে উঠলাম: রেনগোল্ড !

: বুঝেছি মশাই বুঝেছি—আপনি শুধু টাকাটাকেই বড় মনে করেন।

নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছিল। কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেল মুখমণ্ডল।

আবার বললাম, রেনগোল্ড !

অনুভব করলাম—আমার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে এক অব্যক্ত বেদনা ও অনুনয়।

আমার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করলেন রেনগোল্ড। একটু পেছনে সরে এসে বিনীতকণ্ঠে বললেন, ক্ষমা করুন মলটেনি···হঠাৎ কথাটি বলে ফেলেছি।

চকিত চঞ্চলভাবে বললাম, হঁ্যা—হঁ্যা ক্ষমা করলাম।

আমার দু'টি চোখ অশ্রুতে টলমল করছে।

একটু পরে রেনগোল্ড বললেন, বেশ—বুঝলাম, বাত্তিসতাকে জানিয়েছেন—আপনি চিত্রনাট্য লিখবেন না?

: না।

: জানাবেন তো?

: আপনিই তাঁকে বলবেন···তাঁর সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না ······বলবেন—তিনি যেন আর কাউকে দিয়ে চিত্র-নাট্যটি লেখান···

অনুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো—রেনগোল্ডের দু'টি চোখ। তবু তিনি সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলুন তো, আপনি শুধু আমার পরিকল্পিত চিত্রটি করতে চান না,—অন্য কোন ভাবে করতে চান···না?

একটু চিন্তা করে বললাম, বলেছি তো—আপনার প্রস্তাবিত চিত্রনাট্য আমি লিখতে চাই না······স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলে হয়তো আপনার অসুবিধে হতে পারে, তাই ঘুরিয়ে বলছি··বাত্তিসতাকে বলবেন—আমি এ-কাজ করতে পারবো না···আপনারা 'ওডিসি'র যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন—আমার ইচ্ছা নেই······আমার শরীর ভাল নেই······

: কিন্তু—বাত্তিসতা বিশ্বাস করবেন কি?

: করবেন বৈকি······সেজন্য আপনি ভাববেন না।

দু'জনেই চঞ্চল, কিন্তু ভাষা নেই মুখে।

অবশেষে রেনগোল্ড বললেন, তবু আমি অত্যন্ত দুঃখিত—আপনার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি ·····আমাদের মধ্যে কি একটা আপোষ-মীমাংসা হ'তে পারে না?

: এ আপনার ভুল ধারণা, মিঃ রেনগোল্ড···আপোষ সম্ভব নয়······ আমি চাই একটা, আপনি চান আর একটা।

: আমাদের মতের গরমিলটা খুব বেশি নয় হয়তো।

: না, রেনগোল্ড—ভয়ঙ্কর গরমিল···হয়তো আপনি 'ওডিসি'কে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করেছেন, তা'ই ঠিক···তবু এখনও আমার দৃঢ় ধারণা—হোমর যেমন লিখেছেন অবিকল তেমনি করেই 'ওডিসি'কে ছায়াচিত্রে রূপায়িত করা যেতে পারে।

: এটা আপনার দুরাশা, মলটেনি······আপনি চান হোমরের জগতের মতো একটি জগৎ···দুঃখের বিষয়, সেটা সম্ভব নয়।

: আপনি—আপনিও কি সেই জগৎ চান না?

: নিশ্চয় চাই······কিন্তু চিত্র-নির্বাচন করতে হলে শুধু ব্যক্তিগত রুচিই যথেষ্ট নয়······

রেনগোল্ড যেন আমার যুক্তি অনুধাবন করলেন, কিন্তু তাঁর মনের সংশয় পুরোপুরি ঘুচলো না।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম : আচ্ছা রেনগোল্ড, দান্তের কাব্যে 'ইউলিসিস' সর্গটি পড়েছেন নিশ্চয়?

: হ্যাঁ।

: এই সর্গে দান্তে ইউলিসিসের মুখ দিয়ে তাঁর নিজের ও সঙ্গীদের ধ্বংসের কথা বলেছেন।

: জানি।

: এ অংশটি আবৃত্তি করে শোনাতে পারি আপনাকে।

: বেশ তো।

মুখ নীচু করে আবৃত্তি করতে লাগলাম। সহজ স্বাভাবিক শান্ত আমার কণ্ঠস্বর।

আবৃত্তি শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। রেনগোল্ডও দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা, এ অংশটিই বেছে নিলেন কেন, বলুন তো?······এটি সুন্দর, তবু কী উদ্দেশ্যে অংশটা আবৃত্তি করলেন?

: ঠিক তেমনি একটি ইউলিসিস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম আমি··· আমার কল্পনায় রয়েছে এই ইউলিসিস·····আবৃত্তির মাধ্যমে সে-কথাটিই বলে গেলাম।

: কিন্তু দান্তে মধ্য-যুগের লোক, আর আপনি হলেন আধুনিক যুগের।

এ কথার কোন উত্তর দিলাম না। রেনগোল্ড-এর করমর্দন করে বললাম, আবার কখনো আপনার সঙ্গে কাজ করবো···পরিচয় তো হয়েই রইল···আজ আসি।

তাড়াতাড়ি "বার"-এর বাইরে চলে এলাম। রেনগোল্ড টেবিলের সামনে বসে রইলেন—দু'টি হাত বাড়িয়ে। যেন বলতে চাইলেন: কেন······যাচ্ছেন কেন?

উনবিংশ অধ্যায়

সোজা বাড়ি ফিরে এলাম।

মানসিক অস্থিরতা ও বিচিত্র উল্লাসে স্থির ভাবে ভাবতে পারিনি কিছুই। রোদ উপেক্ষা করে ছুটে চলে এসেছি, ভাববার অবকাশ পাইনি —কী হয়েছে। তবে হ্যাঁ, ভেঙে ফেলেছি—দুঃসহ অবস্থার অচলায়তন। অবিলম্বেই জানতে পারবো—এমিলিয়া কেন ভালবাসে না আমায়, শুনবো—তার না-বলা বাণীটি। এর বেশি অগ্রসর হলো না আমার

চিন্তা। কোন কাজ করার ঠিক আগে ও পরে চিন্তা আসে। বিস্মৃত অতীতের ভাবনা অন্তরে যে আবেগ জাগায়, তারই ফলে আমরা কাজ করি। কাজের সময় চিন্তার অস্তিত্ব থাকে না। এতক্ষণ কাজ করছিলাম, তাই কিছু ভাবিনি। জানতাম, কাজ হয়ে গেলেই সব কথা ভাববো আবার।

বাড়ি ফিরে সিঁড়ি বেয়ে শোবার ঘরে এসে দেখলাম—কেউ নেই। চেয়ারের উপর একটি সাময়িক পত্র খোলা পড়ে রয়েছে, অ্যাস্‌-ট্রে থেকে অর্ধদগ্ধ সিগারেটের ধোঁয়া উঠছে, রেডিও থেকে বেরিয়ে আসছে নাচ-গানের চাপা আওয়াজ। বোঝা যাচ্ছে—একটু আগেও এমিলিয়া এখানে ছিল।

অপরাহ্ণের ম্লান আলোয়, হয়তো-বা সেই সংগীতের সুরে মন শান্ত হয়ে গেল অতর্কিতে। আশ্চর্য মনে হ'লো ঘরটির এই নীরব মোহময় পরিবেশ। আমরা যেন অনেক দিন ধরে বাস করছি এখানে। ঘরটিকে একান্ত আপন মনে করছে এমিলিয়া।

হঠাৎ মনে পড়লো—গৃহের প্রতি এমিলিয়ার অনুরাগের কথা, তার নারীসুলভ আকাঙ্ক্ষার কথা। সে যেন একটি স্থায়ী আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে এখানে। লক্ষ্য করলাম, এত সব ঘটনা সত্ত্বেও সে দীর্ঘদিনের জন্য আস্তানা পাতবার ব্যবস্থা করছে এখানে। সত্যিই, ক্যাপ্রিতে এসে খুশি হয়েছে এমিলিয়া, বাত্তিসতার বাড়িতে বাস করার সুযোগ পেয়ে আরো বেশি তৃপ্তি বোধ করছে। আর, আমি তাকে জানাতে এসেছি—যেতে হবে এবার।

উদ্বিগ্নভাবে এমিলিয়ার ঘরের দরজা খুললাম। এমিলিয়া নেই! বিছানার পাশে চেয়ারের উপর রয়েছে তার গাউনটি, নিচে স্লিপার। আয়নার সামনে ড্রেসিং টেবিলের উপর প্রসাধন সামগ্রী পরিচ্ছন্নভাবে

সাজানো। অদূরে টেবিলে একখানি ইংরেজী ব্যাকরণ—কিছুদিন ধরে বইটি পড়ছে এমিলিয়া। রোম থেকে সে যে স্যুটকেশটি এনেছিল তার কোন চিহ্নই খুঁজে পেলাম না। এমিলিয়ার জামাগুলো টাঙানো; সেল্ফ্-এর উপর বড়-ছোট রুমাল, কোমর-বন্ধ, ফিতে ও কয়েক জোড়া জুতো।

ভাবলাম—বাত্তিসতা কিংবা আমি—যাকেই হোক্ সে ভালবাসুক, তা'তে কিছু যায় আসে না। সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি গৃহ, নিশ্চিন্ত নীরব শান্ত একটি আশ্রয়-নীড়ই এমিলিয়ার কাছে বেশি মূল্যবান।

রান্নাঘরের দিকে গেলাম। শোবার ঘরের পেছন দিকটায় রান্নাঘর। উঠানে এসে এমিলিয়ার গলা শুনলাম। সে পরিচারিকাকে উপদেশ দিচ্ছে : মলটেনি সাধারণ খাবারই পছন্দ করে···ঝোল বা ঝাল বেশি খেতে চায় না······সেদ্ধ হলেই চলবে···তা'তে তো তোমারই সুবিধে—খাটুনি কম হ'বে······কি বল, এগ্‌নেসিনা?

: তবু কাজ কী কম?······সাধারণ রান্নাতেও কি কম পরিশ্রম··· তা'হলে—কী কী রান্না হবে এ বেলা?

এমিলিয়া কী যেন ভাবলো। তারপর প্রশ্ন করল, এখন কী মাছ পাওয়া যাবে?······শোন, এক কাজ করো···যারা হোটেলে মাছ দেয়, তাদের কাছে যদি পাওয়া যায়, বেশ বড় দেখে একটি ভাল মাছ এনো··· তবে হ্যাঁ, ভালো হওয়া চাই—কাঁটাওলা মাছ এনো না যেন···মোট কথা, ভাল মাছ যা পাওয়া যায়······মাছটা এনে ভেজে নিতে পার··· সেদ্ধ করে নিলেও চলবে···চাটনি করতে জান তো, তুমি?

: হ্যাঁ, জানি।

: বেশ, তবে সেদ্ধ করে চাটনি করো······আর—সেলাড্···শাক-সব্জি সেদ্ধ—গাঁজর, ডিম······যা' পাওয়া যায়···নানা রকমের ফল···

বাজার থেকে এনে বরফের ভিতর রেখে দিও—যেন খাবার আগে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়······

: সন্ধ্যেয় কী খাবার দেবো?

: ও হ্যাঁ···সাধারণ কিছু খাবো আজ···ভাল দেখে মাংস এনো ···তার সঙ্গে ডুমুর···আচ্ছা, ডুমুর পাওয়া যায় তো এখানে?

: হ্যাঁ।

কেন জানি না, এই ঘরোয়া আলোচনা শুনতে হঠাৎ মনে পড়লো রেনগোল্ড-এর সঙ্গে আলাপের শেষ অংশটুকু। তিনি বলেছেন, হোমরের 'ওডিসি'তে বর্ণিত জগৎ আর আধুনিক জগৎ এক নয়, হোমরের পৃথিবী এ যুগে কল্পনা করা যায় না।···কিন্তু আমার মনে হলো—এ জগতেই রয়েছে এমন একটি পরিবেশ—যা' হাজার হাজার বছর আগে হোমরের যুগেও কল্পনা করা সম্ভব ছিল: গৃহকর্ত্রী পরিচারিকাকে খাবার তৈরী করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

যাদুমন্ত্রের প্রভাবেই যেন মনে হলো—বাস্তিসতার বাগান-বাড়িটি ইথাকার গৃহ, এমিলিয়া পেনিলোপ, সে তার পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলছে।······

হ্যাঁ, সবই অবিকল—যেমন রয়েছে, যেমন হ'তে পারতো। কিন্তু তবু যেন আলাদা।

জানালার কাছে গিয়ে ডাকলাম, এমিলিয়া!

আমার দিকে না ফিরেই সে বলল, কী?

: মনে আছে—তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার?

: ঘরে গিয়ে বসো······এর সঙ্গে কাজটা শেষ করে আসছি।

খাবার ঘরে ফিরে এসে বসে রইলাম একটি চেয়ারে। যা করতে যাচ্ছি সে-কথা ভেবে বিমর্ষ বোধ করলাম। হয়তো এই বাগান-

বাড়িতেই থাকতে চায় এমিলিয়া, আর আমি তাকে জানাতে এসেছি এখান থেকে চলে যাবার কথা। যে দুর্বিষহ পরিবেশের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছিল, এখন তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে এমিলিয়া। তবু, এ যে বিদ্রোহের চেয়েও অস্বস্তিকর! এ শুধু আমার প্রতি অবজ্ঞা নয়, তার নিজের প্রতিও তীব্র ঘৃণার প্রতীক। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই যেতে হবে আমাদের—উভয়ের মঙ্গলের জন্য যেতে হবে। এমিলিয়াকে জানাতে হবে—এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমরা।

একটু পরেই এমিলিয়া এসে বসলো রেডিও-র অদূরে। বলল, কী বলতে চেয়েছিলে বল।

: তোমার জিনিসপত্র সব খুলে ফেলেছ কি?

: হ্যাঁ, কেন?

: সেগুলো আবার বাঁধতে হবে····· আমরা কাল সকালেই রোম-এ ফিরে যাচ্ছি।

নীরবে ভাবলো এমিলিয়া—যেন বুঝতেই পারেনি আমার কথা। তারপর কর্কশকণ্ঠে বলল, এখানে কী হলো আবার?

চেয়ার থেকে উঠে দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে বললাম, চিত্রনাট্যটি লিখবো না ঠিক করেছি···তাই সব ছেড়ে রোম-এ ফিরে যাচ্ছি।

ভ্রূকুটি করে এমিলিয়া বলল, কিন্তু—কেন শুনি?

শুষ্ক কণ্ঠে বললাম, আশ্চর্য হচ্ছি তোমার কথায়···কাল জানালা দিয়ে যা দেখেছি তার পর হয়তো—এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না আমি।

: বাত্তিসতা এ কথা জানেন?

: না···তবে রেনগোল্ড জানেন······এই মাত্র তাঁকে বলে এলাম।

: ভুল করেছ তুমি।

: কেন ?

বিরক্ত হয়েই যেন এমিলিয়া বলল, ফ্ল্যাটের কিস্তি দিতে হবে··· তাছাড়া, তুমি নিজেই তো বলেছ—চুক্তি ভঙ্গ করার মানে ভবিষ্যতের পথে বাধা সৃষ্টি করা···সত্যিই ভুল করেছ তুমি······

উত্তেজিত হয়ে বললাম, কিন্তু তুমি কি জান না ?······এ যে সহ্য করতে পারছি না আর···যে আমার স্ত্রীকে ফুস্‌লে নেবার চেষ্টা করছে, তার কাছ থেকে টাকা নিতে পারবো না আমি ·····

চুপ করে রইলো এমিলিয়া। বললাম, কাজটি ছেড়ে দিচ্ছি কেন জান ?······এ কাজ করা ভালো হবে না আমার পক্ষে···আর—ছেড়ে দিচ্ছি তোমার জন্যও—যেন আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা বদলে যায়···কেন জানি না, এখন তুমি ভাবছ—এ অবস্থায়ও আমি এখানে থাকতে পারি···কিন্তু ভুল তোমার ধারণা···আমি তেমন লোক নই।

এমিলিয়ার দু'টি চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো। সে বলল, যদি তুমি তোমার নিজেরই জন্য এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাও—আমার কিছু বলার নেই···যদি বল যে আমারই জন্য করছ, তবে বলছি—এখনও সময় আছে, মত বদলাও···এমন কাজ করো না···তোমার নিজেরই ক্ষতি হবে ত'াতে।

: মানে ?

: বলছি—তা'তে লাভ হবে না।

মলিন হ'লো আমার মুখখানি। প্রশ্ন করলাম, তারপর ?

: আগে বল—তোমার এই স্বার্থত্যাগে কী লাভ হবে আমার ?

বুঝলাম, চরম মুহূর্ত এসেছে। বললাম, আমার এই সিদ্ধান্তে প্রমাণ করতে চাই—তুমি যেমন মনে কর তেমন নীচ ঘৃণ্য নই আমি।

সুযোগ পেয়ে খুশি হ'য়েই যেন বিজয়গর্বে বলল এমিলিয়া : ওতে কিছু প্রমাণ হবে না……তাই বলছি—তোমার সংকল্প ছাড়।

: কী বলছ তুমি ? কিছু প্রমাণ হবে না ?

আবার বসলাম। হাত বাড়িয়ে এমিলিয়ার হাতটি ধরে বললাম : বল এমিলিয়া !

অদ্ভুত ভাবে হাতখানি টেনে নিয়ে এমিলিয়া বলল, ছেড়ে দাও··· সত্যিই বলছি···আমায় ছুঁয়ো না……ছোঁয়ার চেষ্টা করো না—আমি ভালবাসি না তোমায়···আর ভালবাসতে পারবোও না।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে রুষ্ট কণ্ঠে বললাম, ভালবাসার কথা বলো না··· ও-কথা রাখ···তোমার ঘৃণা সম্বন্ধেই আলোচনা হোক···এ কাজটি ছেড়ে দিলেও কি আমায় ঘৃণা করবে তুমি ?

হঠাৎ অধৈর্য হ'য়ে লাফিয়ে উঠলো এমিলিয়া। বলল, হ্যাঁ···নিশ্চয় ···এখন রেহাই দাও তো আমায়।

: কিন্তু কেন—কেন তুমি ঘৃণা কর আমায় ?

: কারণ—তোমায় ঘৃণা করি···তুমি ঘৃণার যোগ্য···শত চেষ্টা করেও নিজেকে শোধরাতে পার না !

: আমি ঘৃণার যোগ্য ? কী শোধরাতে পারি না ?

: জানি না। সে তো তোমারই জানবার কথা ··আমি শুধু জানি— তুমি পুরুষ নও, তোমার আচরণ পুরুষোচিত নয়।

অবাক হয়ে গেলাম তার কথায়।

রাগ ও শ্লেষের সঙ্গে বললাম, পুরুষ নই—মানে ?

: আহাম্মক !……জান না—তার মানে নেই কিছুই ?

মুখ ফিরিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো এমিলিয়া। ঠিক এমনি করেই যেন আমার উপর থেকে তার অন্তরও ফিরিয়ে নিয়েছে সে।

কী তার কারণ নিজেও জানে না। এ অবজ্ঞার কোন কারণ হয়তো আছে, কিন্তু সে নিজে তা পরিষ্কার ভাবে বলতে পারে না। আমারও কোন দোষ থাকতে পারে।

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম: গত কয়েক মাস ধরে বাত্তিসতা এমিলিয়াকে প্রেম নিবেদন করছেন, আমি তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করছি, নিজের স্বার্থে কোন প্রতিবাদ করছি না।

মনে পড়লো—কয়েকটি ঘটনা: যেদিন প্রথম বাত্তিসতার বাড়ি গিয়েছিলাম সেদিন ট্যাক্সি দুর্ঘটনায় দেরী হয়েছিল আমার···এমিলিয়া ভেবেছে—সেটা তাকে বাত্তিসতার কাছে একা ফেলে রাখারই একটা অজুহাত ছাড়া আর কিছু নয়।

হঠাৎ ঘুরে এমিলিয়া বলল, যেমন ধর—কাল সন্ধ্যায় তুমি যা দেখেছ, সত্যিকারের পুরুষ তা দেখে তোমার মতো ব্যবহার করতো না······তুমি এসেছিলে আমার কাছে, জানতে চেয়েছিলে আমার মত, ন্যাকামো করেছিলে—যেন কিছুই জান না···ভাবছিলে, আমি তোমায় অনুরোধ করবো—চিত্র-নাট্যটি লেখ ···তাই তো বলেছিলাম—তুমি যেমন চেয়েছিলে ঠিক তাই······আর আমার মতটা মেনেছিলে তুমি ······তারপর জানি না—আজ ঐ জার্মানটার সঙ্গে কী কথা হয়েছে তোমার······আজ বলছ—আমারই জন্য, আমি তোমায় ঘৃণা করি বলেই—কাজটা ছাড়ছি······এতদিনে তোমায় চিনলাম······তবে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—তুমি কাজটি কিছুতেই ছাড়তে চাও না, কেউ তোমায় বাধ্য করছে······ইচ্ছা হয়—পৃথিবীর সব কাজ ছেড়ে দিতে পার, কিন্তু আমি আমার মত বদলাতে পারবো না—তোমায় ভালবাসতে পারবো না······তাই বলছি কেলেঙ্কারী করো না, কাজটি যেমন করছ কর, একটু শান্তিতে একা থাকতে দাও আমায়······

আমায় ঘৃণা করে এমিলিয়া। কিন্তু কেন? তার ঘৃণার উৎস সন্ধানের চেষ্টা করতে লাগলাম। কী আর করবো? যথাসম্ভব স্থিরভাবে বললাম: দেখ এমিলিয়া, তুমি আমায় ঘৃণা কর, কিন্তু ঘৃণার কারণটা বলছ না—যদিও তা জানবার অধিকার রয়েছে আমার······তাই বলছি, তোমার কথা সত্যি নয়······নিজেকে সমর্থন করতে পারছি না আমি······আচ্ছা, আমি নিজেই যদি তোমার ঘৃণার কারণটা জানাই, তা'হলে তুমি বলবে—আমার কথা সত্যি কি না?

নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিল এমিলিয়া। ক্লান্ত, রুষ্ট কণ্ঠে বলল: কিছু বলতে পারবো না আমি······দোহাই তোমার, আমায় মুক্তি দাও—মুক্তি দাও···

বললাম, তুমি ভেবেছ—আমি বাত্তিসতার চরিত্র সম্বন্ধে জানতাম ······নিজের স্বার্থের খাতিরে চুপ করেছিলাম······তোমায় ঠেলে দিয়েছিলাম তার বাহুর ভিতর······না?

এমিলিয়া নিরুত্তর।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো আমার কান দু'টি। এ কী বললাম? এতে যে তার ঘৃণার ভিত্তি আরো দৃঢ় হলো।

হতাশ হয়ে বললাম, কিন্তু একথা যদি সত্য হয়, তবে জেনো এমিলিয়া, ভুল করেছ তুমি······কাল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত বাত্তিসতা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না ······আমায় বিশ্বাস কর······যদি না কর, বুঝবো—যেমন করে হোক, আমায় অবজ্ঞা করতে চাও······ কিছুতেই শুনতে চাও না আমার কথা।

তবু এমিলিয়া নীরব। মনে হলো······লক্ষ্য ভেদ করেছি। হয়তো সে জানেই না, জানতেও চায় না—কেন আমায় অবজ্ঞা করে অকারণে

শুধু ঘৃণা করে। তার হাত ধরে বললাম, বল···বল এমিলিয়া, কেন তুমি আমায় ঘৃণা কর?······মুহূর্তের জন্যও কেন ভুলতে পার না সে-কথা?

মুখ ফিরালো এমিলিয়া—যেন লুকাতে চাইলো মুখ, বাধা দিল না আমায়। আরো কাছে এগিয়ে এলাম, সরে গেল না সে। মনে সাহস এলো, তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। দেখলাম—চোখের জলে ভিজে গেছে তার দু'টি গণ্ড। এমিলিয়া বলল, তোমায় ক্ষমা করবো না আমি······তুমিই নষ্ট করেছ আমাদের ভালবাসা······উঃ, তোমায় এত ভালবাসতাম······আর কাউকে এমন ভালবাসিনি কখনও······কখনও বাসবো না······তোমার স্বভাবের দোষেই সব নষ্ট করেছ তুমি······ আমরা সুখী হতে পারতাম·····কিন্তু আজ তা সম্ভব নয় আর······ কেমন করে ভুলবো আমি সব?······কেমন করে পারবো তোমায় ঘৃণা না করে?······

ক্ষীণ আশা জাগলো মনে। তবু সে তো বলেছে—আমায় ভালবাসতো—আর কাউকে ভালবাসেনি—ভালবাসবে না!

এমিলিয়াকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম: শোন, তল্পী-তল্পা গুটিয়ে নাও···কাল সকালেই আমরা যাবো······রোম-এ গিয়ে সব বলবো ······তা' হলেই বিশ্বাস হবে তোমার······

এক টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এমিলিয়া বলল, না-না, আমি যাবো না। কী হবে রোম-এ ফিরে গিয়ে? ফ্ল্যাটটি ছেড়ে দিতে হবে ···মা আমায় চান না···ভাড়াটে বাড়িতে থাকতে হবে···টাইপিষ্ট হ'তে হবে আবার···না, আমি যাবো না······এখানেই থাকবো···বাত্তিসতা বলেছেন—যতদিন খুশি এখানে থাকতে পারি···থাকবো···আমি এখানেই থাকবো।

ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, কাল সকালে আমার সঙ্গে যাবে তুমি …যেতেই হবে তোমাকে, বুঝলে ?

: ভুল—ভুল করছ তুমি…আমি যাবো না—কিছুতেই যাবো না।

: বেশ, তবে আমিও থাকবো…দেখবো—বাস্তিসতা যা'তে দু'জনকেই দূর করে দেন।

: না, তুমি থাকতে পারবে না।

: আলবৎ পারবো।

একবার আমার দিকে কটমট করে চেয়ে নীরবে ঘর ছাড়লো এমিলিয়া।

সশব্দে বন্ধ হলো ঘরের দরজা। তালায় চাবি ঘোরানোর আওয়াজ কানে বাজলো।

বিংশ অধ্যায়

উত্তেজনার মুহূর্তে বলেছি—এখানে থাকবো !

এমিলিয়া চলে যাবার পর বুঝলাম—এখানে থাকা আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। যেতেই হবে আমাকে। রেনগোল্ড, বাস্তিসতা—এমন কি এমিলিয়ার সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই আমার। এক কথায়, আমি এখন অবাঞ্ছিত। মনের ক্ষীণ আশাটুকু তখনও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়নি, তাই বলেছি—এখানেই থাকবো।

এমন অবস্থা হাস্যকর—কিন্তু আমার মনের এ অবস্থায় গভীর বেদনাদায়ক। দুর্গম পথের অভিযাত্রী যেন পর্বতের বিপজ্জনক স্থানে উঠে বুঝতে পারছে—যায়গাটি নিরাপদ নয়, অথচ এগোবার বা পেছুবার কোন উপায় নেই।

চিন্তা ও উত্তেজনায় ছুটোছুটি করলাম ঘরের ভিতর। কী করব এখন? বাত্তিসতা ও এমিলিয়ার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে পারবো না আজ। ভাবলাম—বাইরে কোথাও খাবো, দেরী করে বাড়ি ফিরবো। কিন্তু প্রখর রোদে চার বার একই রাস্তার উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই আর বেরোবার ইচ্ছা হলো না।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—মাত্র ছ'টা। এখন কী করি? অবশেষে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। ঘরে তালা লাগিয়ে খড়খড়ি বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়লাম।

নির্ভয়ে ঘুমোলাম কিছুক্ষণ। মনে হলো—রাত হয়েছে অনেক। বিছানা থেকে উঠে জানালা খুলে দেখলাম—চারদিক অন্ধকার, নীরব। আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম—রাত ন'টা। তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। ভাবলাম, ডিনারের টেবিলে গিয়ে বাত্তিসতার সঙ্গে ঝগড়া করবো—যাতে তিনি আমায় ঘর থেকে বার করে দিতে বাধ্য হন।

খাবার ঘরে এসে দেখলাম—কেউ নেই। এক কোণায় একটি টেবিল পাতা, টেবিলের উপর শুধু একজনের খাওয়ার যায়গা করা হয়েছে। পরিচারক এসে জানাল, বাত্তিসতা ও এমিলিয়া বেরিয়েছে, ইচ্ছে হ'লে আমি রেস্তোরাঁয় গিয়ে ওদের সঙ্গে খেতে পারি, নয়তো ঘরেও খেতে পারি······ডিনার তৈরী রয়েছে।

বাত্তিসতা ও এমিলিয়া তা'হলে ভেবেছে—কী করবো এখন? কিন্তু আমায় একা ফেলে গিয়ে তাদের সমস্যা সমাধান করেছে তারা। ঈর্ষা, বিরক্তি বা হতাশা জাগলো না মনে, অসহ্য মর্মবেদনা অনুভব করলাম। এ যেন আমায় তাড়াবার একটা ফিকির!

পরিচারককে বললাম, আমি এখানেই খাবো।

খাবার টেবিলে এসে বসলাম, খাওয়ার প্রবৃত্তি হলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই খাওয়া শেষ করলাম। পরিচারককে ছুটি দিয়ে বারান্দায় এলাম। পাঁচিলের কাছে একটি চেয়ার এনে বসলাম অন্ধকার অদৃশ্য সমুদ্রের দিকে মুখ করে। রেনগোল্ড-এর কাছ থেকে এসে ভেবেছিলাম—এমিলিয়ার সঙ্গে কথা বলবো, তারপর সব ঠিক করবো স্থির মস্তিষ্কে, এমিমিলিয়ার জবাব শুনে মনের অস্পষ্টতা ও আশঙ্কা দূর হবে। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা হয়নি, যতটুকু জানতাম তার চেয়ে বেশি জানতে পারিনি এতটুকু, বুঝেছি—আমাদের অতীত সম্পর্কটুকু অনুধাবন করলেই হয়তো আমার উপর এমিলিয়ার বিদ্বেষের কারণ নির্ণয় করতে পারতাম। কিন্তু এমিলিয়া তা চায় না, সে চায়—অকারণে আমাকে ঘৃণা করতে, আমার ভালবাসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে।

বুঝলাম, কোন সত্য বা কাল্পনিক যুক্তি নেই তার এ ঘৃণার। জানি না, আমার আচরণ সেজন্য দায়ী কিনা। কষ্টি পাথরে ঘষে সোনা খাঁটি কিনা বোঝা যায়। ঠিক তেমনি দু'টি চরিত্রের দৈনন্দিন সংঘর্ষ থেকেই জন্মেছে তার সত্য ধারণা। বাত্তিসতার সঙ্গে তার আচরণ সম্পর্কে আমি যে অমূলক সন্দেহ করেছি তা'তেই আমায় অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছে এমিলিয়া। অবশ্য কোন প্রতিবাদ করেনি সে, নীরব রয়েছে শুধু। প্রথম থেকেই সে যেন ধারণা করে আসছে—আমি এমনিই, ঘৃণাই আমার ন্যায্য পাওনা। আমার কাজে আরও বদ্ধমূল হয়েছে তার মনোভাব। হয়তো অন্যভাবে সে বিচার করেছে আমায়। এমিলিয়ার অদ্ভুত আচরণই তার প্রমাণ। গোড়া থেকেই সে প্রতিরোধ করতে পারতো এই ভুল বোঝাবুঝি, স্পষ্টভাবে সব কথা বলে অটুট

রাখতে পারতো আমাদের প্রণয় সম্পর্ক। সে তা করেনি। প্রতারিত হতে চায় না সে, চায়—আমায় ঘৃণা করতে।

ডেক-চেয়ারে শুয়েছিলাম এতক্ষণ, কিন্তু মনের চিন্তা ও উত্তেজনা অসহ্য বোধ হলো। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম তাই। রাত্রির মৌন শান্তির কথা ভেবে হয়তো শান্ত করতে চাইলাম নিজেকে, তপ্ত মুখমণ্ডলে সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসা বাতাসের শীতল স্পর্শ লাগাতে চাইলাম। কিন্তু আমি যেন স্বস্তি পাবার যোগ্য নই। আমি অবজ্ঞার পাত্র, শান্তি পাবো কেমন করে? শেষ বিচারের দিন পাপীদের মতো অবজ্ঞাত-ও প্রার্থনা করতে পারে, হে নগরাজি! ভেঙে পড় আমার মাথার উপর, ওগো নীল পাহাড়! ঢেকে ফেল আমায়······কিন্তু ঘৃণা তাকে ছাড়বে না কিছুতেই, সুদূর গোপন নিভৃত কক্ষেও অনুসরণ করবে, যেখানে যাবে সেখানেই থাকবে তার সঙ্গে।

অবজ্ঞাত আমি, শান্তির আশা নেই আমার জীবনে।

ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালাম কম্পিত হস্তে। না,—ঘৃণার্হ হলেও আমি নগণ্য নই, বুদ্ধিভ্রংশও হইনি। এমিলিয়া স্বীকার করেছে আমার এ গুণ! এই তো আমার গর্ব। ভাবতেই হবে আমাকে। স্থির চিন্তা ও বুদ্ধি ছাড়া কোন রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যায় না। বুদ্ধি না খাটালেই এই অকারণ অবমাননার বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ভাবতে লাগলাম: কেন—কেন আমার এই ঘৃণ্য অবস্থা? মনে পড়লো—ইউলিসিসের সঙ্গে পেনিলোপের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে আমারই সঙ্গে এমিলিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে রেনগোল্ড যে কথাগুলি বলেছিলেন:······ইউলিসিস হচ্ছেন সুসভ্য পুরুষ, আর পেনি-লোপ আদিম নারী·········

'ওডিসি'র কেন্দ্রগত ভাব বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে আমার ও এমিলিয়ার সম্পর্কের চরমতম সঙ্কট মুহূর্তটিকে অজ্ঞাতসারে টেনে এনেছিলেন তিনি। রেনগোল্ড-এর মতে, আমি ঘৃণ্য নই—সুসভ্য। এই আমার সান্ত্বনা। সত্যই আমি এক সুসভ্য মানুষ; আদিম যুগের মানুষ যে-অবস্থায় শানিত তরবারির আশ্রয় গ্রহণ করতো সে-অবস্থায়ও যুক্তি প্রয়োগ করতে চাই……। না, না—এ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা নয় আর,—তা'তে সন্তুষ্ট থাকতে পারবো না আমি। তাছাড়া, সত্যিই ইউলিসিস ও পেনিলোপের মধ্যে যে সম্পর্ক চিত্র-পরিচালক কল্পনা করেছেন, আমার ও এমিলিয়ার মধ্যে কি সে-সম্পর্কই ছিল? মানুষের বিবেকের জগৎ স্থান ও কালের সীমা ছাড়িয়ে যায়, সেখানে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তেমন খাটে না, অন্তর থেকেই নির্দেশ আসে……

হ্যাঁ, ইতিহাস আমাকে শুধু তার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। কিন্তু এখন যে-অবস্থায় রয়েছি তার যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাই করি না কেন—সে-অবস্থায় বাস করতে চাই না আমি।……

তবে, এমিলিয়া কেন ভালবাসে না আমায়? কেন সে আমায় ঘৃণা করে? তা'তে তার কী প্রয়োজন? মনে পড়লো—তার সুস্পষ্ট মন্তব্য: 'পুরুষ নও তুমি'!……এই উক্তিটির মধ্যেই ফুটে উঠেছে এমিলিয়ার কল্পিত আদর্শ পুরুষের মূর্তি। এই হলো তার ঘৃণার মূল। আমার মধ্যে সে খুঁজে পায়নি তার ঈপ্সিত আদর্শ পুরুষকে। এ রূপ শুধু তার কল্পনায় গড়া নয়। যে পৃথিবীতে সে এতদিন বাস করে আসছে তার সংস্কার থেকেই এর জন্ম। সে-জগতে পুরুষের মতো পুরুষ হলো—পশুর মতো বলবান ও সাফল্য-গৌরব-দৃপ্ত বাত্তিসতা। তার প্রমাণ পেয়েছি—বাত্তিসতার প্রতি এমিলিয়ার শ্রদ্ধামাখা দৃষ্টি থেকে, আর তার আত্মদানের দৃশ্য দেখে। বাত্তিসতার জগতের সঙ্গে সে জড়িয়ে

পড়েছে। সে-জগতে রয়েছে ধনীর হাত থেকে নির্ধনের মুক্তি অথবা 'পুরুষ হবার' কাল্পনিক অক্ষমতা। সারল্য ও অস্পষ্টতা সত্ত্বেও এমিলিয়া ঘৃণা করে আমায়—ঘৃণা করতে চায়। জানি না, স্বার্থেরই খাতিরে আমি বাত্তিসতাকে সমর্থন করি—এ সন্দেহ সে পোষণ করে কিনা। যদি তাই হয়, তবে সে ভেবেছে: রিকার্ডো বাত্তিসতার মুখাপেক্ষী, বাত্তিসতা আমায় প্রেম নিবেদন করছে···রিকার্ডো চায়—আমি বাত্তিসতার উপপত্নী হই।

আশ্চর্য! আগে কেন ভাবিনি এ কথা? বাত্তিসতা ও রেনগোল্ড 'ওডিসি'র যে ব্যাখ্যা করেছেন তা'তে বুঝেছি—তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু কেন বুঝতে পারিনি—এমিলিয়াও ঠিক তাঁদেরই দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে আমার মূর্তি কল্পনা করে; তফাৎ শুধু এই যে—ওঁরা দু'টি কাল্পনিক মূর্তির সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু অবজ্ঞার ভিতর দিয়ে এমিলিয়া প্রকাশ করেছে তার মনের ভাব।

এমিলিয়া সরল প্রকৃতি, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে ঔদ্ধত্য। নিজের সারল্য ও ঔদ্ধত্যের সংমিশ্রণেই হয়তো তার মনে ধারণা জন্মেছে যে আমি তাকে ঠেলে দিয়েছি বাত্তিসতার দিকে। হয়তো রেনগোল্ড-এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছে এমিলিয়া, আমার ভাষ্য সে বুঝতে পারে না। হোমর ও দান্তের স্তরে সে উঠতে পারে না, কারণ সে আদর্শের জগতে বাস করে না, বাস করে—বাত্তিসতা ও রেনগোল্ড-এর মতো লোকের জগতে।

তবু—তবু এই এমিলিয়াই ছিল আমার স্বপ্ন। আর—সে-ই আমার বিচার করছে আজ, একটি তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য ঘৃণা করছে আমায়।

পেনিলোপ তার অনুপস্থিত স্বামীর অনুগতা ছিল সুদীর্ঘ দশটি বৎসর, কিন্তু এমিলিয়া অকারণে আমায় ঘৃণা করছে। তার ভালবাসা

পাওয়ার জন্য ও তাকে বোঝাবার আকুলতায় আমি যা করেছি তা দিয়েই আমাকে বিচার করেছে। সেই পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে আনতে হবে এমিলিয়াকে, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে একটি জগতের—যেখানে অর্থের কোন দাম নেই, বাণী যেখানে সুস্পষ্ট ও ত্রুটিহীন। আমার অভীপ্সিত যে জগৎ—যার অস্তিত্ব নেই, সেখানে নিয়ে আসতে হবে এমিলিয়াকে।

আপাততঃ বাত্তিসতা ও রেনগোল্ড-এর জগতেই থাকতে হবে। এখন কী করবো? হ্যাঁ, মনের সঙ্কোচ কাটিয়ে ফেলতে হবে, এমিলিয়াকে বুঝিয়ে দিতে হবে—আমার আচরণের জন্য নয়, প্রকৃতিগত দুর্বলতার জন্যই সে ঘৃণা করে আমায়।

'ওডিসি' সম্বন্ধে আমার কল্পিত রূপটিই সত্য, আসলে সেটিই হলো হোমরেরও আদর্শ। বাত্তিসতা, রেনগোল্ড ও আমি ইউলিসিসকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছি—কেন না, আমাদের জীবন ও আদর্শ এক নয়। বাত্তিসতার ব্যক্তিগত জীবন ও আদর্শ বা স্বার্থের সঙ্গে মিল রেখেই তিনি কল্পনা করেছেন ইউলিসিসকে। রেনগোল্ড-এর কল্পিত রূপ আরও বাস্তব ও স্থূল—তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারই অনুকূল, আর আমার রূপ হলো—মহান অথচ স্বাভাবিক, বাস্তব। অর্থ যে জীবনকে কলঙ্কিত বা সঙ্কুচিত করতে পারে না কিংবা যে জীবন কখনও সম্পূর্ণ দৈহিক ও পার্থিব স্তরে নেমে আসে না—তেমনি একটি জীবনের নিষ্ফল অথচ আন্তরিক অভিলাষ থেকেই আমার এ রূপ-কল্পনা।

হয়তো চিত্রনাট্যে ফুটিয়ে তোলা যাবে না এ রূপ, তবু ঠিক তেমন জীবন-যাপনের চেষ্টা করতে হবে আমাকে।...এমনি করেই ফিরিয়ে আনতে হবে এমিলিয়ার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

কিন্তু—কেমন করে? কী উপায়ে?

আরো বেশি ভালবাসতে হবে তাকে। যখন চাই, যতবার প্রয়োজন হয় ততবার—আমার প্রেমের পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতার প্রমাণ দিতে হবে।

তবে হ্যাঁ! এখন এমিলিয়াকে জোর করলে ভালো হবে না। আজ এখানেই থাকবো, কাল চলে যাবো। রোম-এ গিয়ে চিঠি লিখে জানাবো সব কথা—যা মুখে বলতে পারিনি।......

বারান্দার নিচে এমিলিয়া ও বাত্তিসতার কণ্ঠস্বর শুনলাম। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম, কিন্তু ঘুম এলো না। মনে হলো—ওরা দু'জনে বাগানবাড়িতে ঘোরাফেরা করবে, গুঞ্জন করে বেড়াবে আমার চারদিকে। আমি সইতে পারবো না তা।

কিছুদিন ধরে ভাল ঘুম হচ্ছিল না, তাই রোম থেকে আসার সময় ঘুমের ওষুধ কিনে এনেছিলাম এক শিশি। একসঙ্গে দু'মাত্রা ওষুধ ঢেলে খেয়ে ফেললাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম।

এমিলিয়া ও বাত্তিসতার গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা গেল না আর।...

একবিংশ অধ্যায়

ঘুম ভাঙলো। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সূর্যালোক উঁকি মারছে। বুঝলাম, বেলা হয়েছে বেশ। বিছানায় শুয়ে চারিদিককার মৌনতার ভাষা শুনলাম। নগরের নীরবতার সঙ্গে এর এতটুকু মিল নেই। সেখানকার পরিপূর্ণ পবিত্রতার মধ্যেও যেন রয়েছে অতীত ক্ষত ও বেদনার প্রতিধ্বনি। বিছানায় বসে কান পেতে শুনলাম—আরো নিবিষ্টভাবে শুনলাম।

হঠাৎ কিসের অভাব বোধ করলাম। এখানে যেন কী একটি অপরিহার্য বস্তু নেই। এ যেন লোকালয়ের নীরবতা নয়, জড় জগতের নির্জনতা। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে এমিলিয়ার ঘরের দরজার সামনে এলাম। দরজা খুলতেই চোখে পড়লো একখানি চিঠি। পরিত্যক্ত, অবিন্যস্ত শয্যার উপর মাথার বালিশের নিচে চাপা-দেওয়া চিঠিখানি নিয়ে পড়লাম। সংক্ষিপ্ত একটি লিপি:

প্রিয় রিকার্ডো,

দেখলাম, তুমি যেতে চাও না, তাই আমিই যাচ্ছি। একা যাবার সাহস হতো না। বাত্তিসতা যাচ্ছেন। সে-সুযোগই গ্রহণ করলাম। একা একা ভয় করে আমার। তাছাড়া, একেবারে নিঃসঙ্গ হওয়ার চেয়ে বাত্তিসতার সঙ্গ খারাপ নয়। রোম্‌-এ গিয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে যাবো, নিজেই নিজের জীবিকা উপার্জন করবো। তবে, যদি শুনতে পাও— বাত্তিসতার উপপত্নী হয়েছি, আশ্চর্য হয়ো না যেন। রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ আমি। তখন জেনো যে নিজেকে বাঁচাতে পারিনি। বিদায়…

এমিলিয়া

বিছানার উপর বসে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। চিঠিখানি হাতেই রইলো।

খোলা জানালা দিয়ে দেখলাম—বাইরে কয়েকটি পাইন গাছ, তার পেছনে প্রাচীর। চোখ ঘুরিয়ে ঘরের ভিতর দেখলাম একবার। সবই এলোমেলো, শূন্য—জামা-কাপড়, জুতো, প্রসাধন সামগ্রী—কিছুই নেই। ক'দিন ধরে যে বিপদের আশঙ্কায় দিন কাটিয়েছি, আজ সে-বিপদ এসেছে। ছিন্নমূল তরুর যদি অনুভব-শক্তি থাকে, তাহলে সে তার মূলের ভিতরে যে বেদনা বোধ করে, ঠিক তেমনি মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করলাম। সত্যিই, অতর্কিতে ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি আমি,

বৃক্ষের মতো আমার মূল উৎপাটিত হয়েছে, আমার প্রিয় মৃত্তিকা এমিলিয়া—যে তার প্রেম দিয়ে মূলগুলিকে সতেজ ও সজীব করেছিল—দূরে সরে গেছে আজ। মূল আর সেই প্রেমের স্পর্শ পাবে না, আহরণ করতে পারবে না মাটির রস-সুধা—নিষ্প্রাণ শুষ্ক হয়ে যাবে ধীরে ধীরে।

বিষণ্ণ, ব্যথিত চিত্তে ঘরে ফিরে এলাম। মনে বিস্ময়ও জাগলো সঙ্গে সঙ্গে। আমি যেন অনেক উঁচু থেকে নিচে পড়েছি, একটু পরেই খিঁচুনি আরম্ভ হবে। হিংস্র পশুর নিশ্চিত আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে অসহায় জীব ব্যাকুল দৃষ্টিতে নিহন্তার দিকে চেয়ে যে মর্মবেদনা অনুভব করে, ঠিক তেমনি নিদারুণ ব্যথা বাজলো আমার বুকে।

স্নানের জামাটি তুলে নিয়ে বাইরে রাস্তায় নেমে এলাম। বাজারে এসে একটি সংবাদপত্র কিনে 'কাফে'তে বসলাম। কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যে সাবাদপত্র পড়া শেষ হয়ে গেল। নিষ্ঠুর শিশু যখন মাছি ধরে তার মাথাটি ছিঁড়ে ফেলে, তখন মাছিটি টেরই পায় না কিছু, সে-অবস্থায় কিছুদূর এগিয়ে যায়, তারপর নিশ্চল হয়ে পড়ে। আমার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মাছির অবস্থার তুলনা করা চলে।...

দুপুর হলো। সমুদ্রতীরগামী বাস ছাড়ছে। বাস-এ উঠলাম। একটু পরেই রোদ-ভরা ফাঁকা মাঠ চোখে পড়লো। ধীরে ধীরে স্নানের ঘাটে এসে সিঁড়ির নিচে নেমে এলাম। দেখলাম—শাদা বেলাভূমি, প্রশান্ত নির্মল আকাশের নিচে নীল সমুদ্র—স্থির দিগন্তলীন।

সমুদ্রের জল রেশমের মতো চক্‌চক্ করছে। পাঁকগুলি আলস্যভরে ঘুরে ঘুরে চলেছে। ভাবলাম, নৌকায় চড়বো। দাঁড় টানলে মনের চিন্তা কমে যাবে, তা'ছাড়া একা থাকবার সুযোগ পাবো। ঘাটে এসে রক্ষীকে নৌকা আনতে বললাম। বৃদ্ধ রক্ষী মাথার খড়ের টুপিটি

চোখের উপর টেনে দিল, নৌকাটি অর্ধেক জলে ঠেলে দিয়ে নৌকার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। দেখলাম—নৌকায় স্থিরভাবে বসে আছে এমিলিয়া। তার গায়ে আমার বহু পরিচিত সবুজ জামাটি। পা দুটি গুটিয়ে, পেছন দিকে হাত ছড়িয়ে, কোমরটি একটু সঙ্কুচিত করে রয়েছে সে। অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। আমার বিস্ময় দেখে সে মুখ টিপে হাসছে, চেয়ে আছে আমার চোখে চোখে, চোখের নীরব ভাষায় যেন বলছে—আমি এখানেই রয়েছি···কিছু বলো না আমায়—আজ কোন কথা নয়।

তার অব্যক্ত আদেশ পালন করলাম। আলোড়ন জাগলো মনে। হাতখানি বাড়িয়েই ছিল রক্ষী। তার হাত ধরে নৌকায় উঠে ঘাড় নিচু করে দাঁড় টানতে লাগলাম। প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছলাম অন্তরীপে। এতক্ষণ এমিলিয়ার দিকে তাকাইনি, একটি কথাও বলিনি। সংযত করে ছিলাম নিজেকে। এমিলিয়ার সঙ্গে নিরিবিলি বসে আলাপ করাই আমার অভ্যেস, বাত্তিসতার বাগান-বাড়িতেও সেই পুরনো অভ্যাস ছাড়িনি।

দাঁড় টানতে টানতে বিচিত্র অভিনব আনন্দের সঙ্গে মেশানো বেদনার অনুভূতিতে দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। চোখের লোনা জলে চোখ জ্বালা করতে লাগলো, ভেসে যেতে লাগলো গণ্ডদ্বয়।

অন্তরীপের অপর প্রান্তে এসে উজান স্রোত লক্ষ্য করে। সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কলকল ছলছল শব্দ উঠছে সেখানে। ডান দিকে একটি নিচু কালো পাহাড়-চূড়া দেখা যাচ্ছে জলের উপরে। বাম দিকে, অন্তরীপের পেছনে উঁচু পাথরের প্রাচীর। জোরে দাঁড় টেনে সে-যায়গাটি পেরিয়ে এলাম। পাহাড়টি যেখানে ডুবে রয়েছে সেখানে জল শাদা, ভাঁটার টানে সামুদ্রিক শেওলার সবুজ শ্মশ্রু দেখা যাচ্ছে,

টম্যাটোর মতো লাল লাল ফল জলের উপর ভাসছে। অন্তরীপের শেষ সীমায় রয়েছে একটি পাথরের রঙ্গমঞ্চের মতো—পেছনে সম-বিলম্বিত পাহাড়ের দেয়াল, বিক্ষিপ্ত পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সম্পূর্ণ জনহীন তটভূমি। সমুদ্র-বক্ষও নির্জন—স্নানার্থীর ভিড় নেই, নৌকা নেই। জল ঘন, উজ্জ্বল নীল—দেখেই মনে হয় গভীর। আরো দূরে অন্তরীপের সারি—কাল্পনিক রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বদেশের মতো।

নৌকার বেগ কমিয়ে এমিলিয়ার দিকে। মুখ তুলে চাইলাম সেও যেন কী বলতে চায়। আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে সে প্রশ্ন করল, কাঁদছ কেন তুমি ?

: বললাম, আনন্দের আতিশয্যে।

: আমায় দেখে খুশি হয়েছ ?

: খুশি ?······নিশ্চয়। ভেবেছিলাম, তুমি চলে গেছ আমায় ফেলে।

চোখ নামিয়ে এমিলিয়া বলল, যাবো ঠিক করেছিলাম ··বাত্তিসত্তার সঙ্গে ষ্টীমার-ঘাট অবধি গিয়েছিলাম···শেষ মুহূর্তে ঠিক করলাম—যাবো না, রয়ে গেলাম তাই।

: এখানে কী করছিলে ?

: বন্দরটা ঘুরে দেখলাম···'কাফে'তে গেলাম···বাগানবাড়িতে টেলিফোন করে জানলাম, তুমি বেরিয়েছ···ভাবলাম, এখানেই এসেছ তাইতো এলাম ··দেখলাম, তুমি নৌকো আনতে বলছ···একটু রোদে শুয়েছিলাম···আমার পাশ দিয়ে চলে গেলে তুমি, আমায় দেখতেই পেলে না···তারপর তুমি যখন কাপড় বদলাছিলে, তখন আমি এসে নৌকায় বসলাম······

চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ।

আর একটু এগোলেই 'সবুজ-গুহা'। ভাবলাম, সেখানে গিয়ে স্নান করবো।

প্রশ্ন করলাম; বাস্তিসতার সঙ্গে গেলে না কেন?

: ভেবে দেখলাম—ভুল করেছি।···সবটা ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছু নয়।

: কী দেখে বুঝলে?

: ঠিক জানি না ·····তবে অনেক কিছু······হয়তো—কাল সন্ধ্যেয় তোমার কণ্ঠস্বর শুনে—

: তবে, কি তুমি সত্যই বুঝেছ—আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ ভিত্তিহীন?

: হ্যাঁ।

: কিন্তু—তুমি কি মনে কর না—আমি ঘৃণ্য? বল—বল এমিলিয়া। ·· এই কি তোমার শেষ কথা?

: ভেবেছিলাম, তুমি কী একটা করেছিলে,—আর তাই আমার শ্রদ্ধা হারিয়েছিলে, কিন্তু এখন জেনেছি—সবই ভুল বোঝাবুঝি···কিছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি।······

দু'জনেই নীরব।

আরো জোরে দাঁড় টানতে লাগলাম। দেহে যেন দ্বিগুণ শক্তি এসেছে, মনে স্ফূর্তির সীমা নেই। মনের আনন্দ বাইরের রোদের মতো ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো, উষ্ণতায় শিহরণ জাগলো সর্বাঙ্গে।

'সবুজ-গুহা'র বিপরীত দিকে এসে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি সত্যিই আমায় ভালবাস?

একটু ইতস্ততঃ করে এমিলিয়া বলল, চিরদিনই ভালবেসেছি তোমায়···ভালবাসবো চিরদিন······

কিন্তু একী ? তার মুখে বেদনার ছায়া কেন ?

শঙ্কিতভাবে বললাম, অমন করে—এত বিমর্ষভাবে কথাটি বললে কেন ?

: জানি না···হয়তো, তার কারণ—যদি দু'জনের মধ্যে এমন ভুল বোঝাবুঝি না হতো—আগের মতো পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসতাম !

: হ্যাঁ···কিন্তু এখন তো ভুল বোঝাবুঝি নেই···ও কথা আর না ভাবাই উচিত···এখন থেকে অবিচ্ছেদ্য হবে আমাদের প্রেম-বন্ধন ···কী বল ?

যেন ঘাড় নাড়লো এমিলিয়া, চোখ তুললো না।

দাঁড় টানা বন্ধ করে বললাম : লাল গুহায় যাবো আমরা··· সেখানে খানিকটা ডাঙা রয়েছে···আব্‌ছা অন্ধকার যায়গাটি নির্জন··· সেখানে গিয়ে নতুন করে সুরু করবো সেই পুরানো জীবন··· রচনা করবো আমাদের নিভৃত মিলন-কুঞ্জ···চালাবো বাধাহীন প্রেমলীলা।

একবার চোখ তুলে চাইলো এমিলিয়া। ঘাড় নেড়ে জানাল নীরব সম্মতি। তার মুখখানি লজ্জারুণ।

'লাল-গুহা'র দিকে চললাম।

গভীর উৎসাহে দাঁড় বেয়ে চলেছি। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে এমিলিয়া, চোখে কামনার আকুলতা, সে যেন আত্মদানের চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছে।

'লাল-গুহা'য় এসে ভিতরে টেনে আনলাম নৌকাটি। বললাম, এখানে অন্ধকার···তবে ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার নয়······কোন অসুবিধে হবে না।

অন্ধকারের মধ্যে নৌকাটি দেখতে পেলাম না আর। একটি শব্দ হলো। দাঁড় ছেড়ে দিলাম। নৌকার পেছনের দিকটায় গিয়ে বললাম, তোমার হাতটা দাও…আমার হাত ধরে নেমে এসো…

কোন উত্তর নেই!

ডাকলাম, এমিলিয়া—আমার হাত ধর—

হাতটি বাড়ালাম, তবু কোন সাড়া পেলাম না। অন্ধকারে হাতড়ে দেখলাম, যেখানে এমিলিয়া বসেছিল সেখানে হাত দিলাম। কোথায় গেল এমিলিয়া? বুক কেঁপে উঠলো। ডাকলাম, এমিলিয়া! প্রতিধ্বনি শুনলাম। অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম—নৌকাটি স্থিরভাবে রয়েছে সৈকতের ওপর, মাথার উপরে গুহার ছাদটি—বেশ অন্ধকার, ঝির ঝির করে জল ঝরছে উপর থেকে, নৌকায় কেউ নেই—জন মানবের চিহ্ন নেই কোথাও, আমি শুধু একা!

আকুল কণ্ঠে আবার ডাকলাম, এমিলিয়া, তুমি কোথায়?……

……তক্ষুনি ভেঙে গেল ভুল। নৌকা থেকে নেমে ভিজে নুড়ির উপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম, হয়তো—মূৰ্ছিত হয়ে পড়ে রইলাম।

পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে নৌকা বেয়ে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে। গুহার মুখে এসে হাতের ঘড়ি দেখলাম—বেলা দু'টো। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় কাটিয়েছি গুহার মধ্যে।

বুঝলাম—সেই মধ্যাহ্নে এক ছায়ামূর্তির সঙ্গে কথা বলেছি, তারই কাছে ফেলেছি নিষ্ফল অশ্রু!

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ধীরে ধীরে নৌকা বেয়ে আসতে লাগলাম—স্নানের ঘাটের দিকে। মাঝে মাঝে দাঁড় টানা বন্ধ করে দাঁড়টি হাতে নিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো চেয়ে রইলাম রৌদ্রদীপ্ত নীল সমুদ্রের শান্ত বুকের দিকে।

আমার যেন মতিভ্রম ঘটেছে। দু'দিন আগেও এমন হয়েছিল। দেখেছিলাম : এমিলিয়া রোদে শুয়ে আছে, আর আমি তার মুখে চুমো খাচ্ছি। কিন্তু আসলে আমি ছিলাম তার কাছ থেকে দূরে, একটুও এগোইনি তার দিকে। আজকের এই ভ্রমটা আরো স্পষ্ট। না-না, এ শুধু ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। আলেয়ার সঙ্গে কথা বলেছি আমি, এমিলিয়াকে যা বলতে চেয়েছি তা'ই বলেছি তাকে ; এমিলিয়ার কাছ থেকে যা শুনতে চেয়েছি—শুনেছি তা'ই ; তাকে যেমন ভেবেছি—দেখেছি ঠিক তেমনি ভাবেই। অস্বাভাবিক, তুলনাহীন এ মায়ায় বিস্মিত হইনি এতটুকু। কিন্তু এখনও কাটেনি সেই মায়া-ঘোর। ভাবতে লাগলাম—এ সম্ভব কিনা। আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করলাম সেই দৃশ্যের কল্পনায় :

নৌকার উপর বসে আছে এমিলিয়া···কী অপরূপ লাবণ্যময়ীই না দেখাচ্ছে তাকে······তার মুখে উদ্ধত ভাব নেই আর······প্রেমময়ী সে···মধুর তার কণ্ঠস্বর······আমি তাকে জানিয়েছি আমার মিলন কামনা······আমার প্রস্তাবে সে সম্মতি জানিয়েছে····· তাকে দেখে চঞ্চল হয়েছে আমার মন······

ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ স্বপ্ন দেখে লোকে যেমন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, পুলকাবিষ্ট হয় সে-কল্পনায়, গড়িমসি করে, ঠিক তেমনি আমার মনে

হলো—এ মায়া নয়, সত্য। মনের আনন্দে স্মরণ করলাম সে-দৃশ্য। হোক সে আলেয়া, আমার কাছে এ ঘটনা বাস্তব।

অভ্রান্ত, অনাবিল, অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি ভরে ভাবতে লাগলাম। এ যেন আমার মনের গোপন আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক!

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি, ঘুমের মধ্যে কথা বলেছিলাম এমিলিমার সঙ্গে, তাকে রাজী করিয়েছিলাম, হাত ধরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে না দেখে ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম।······আবার ভেবে দেখলাম—হয়তো সবটাই স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমারেখা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব মনে হলো।······গুহায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি কী স্বপ্ন দেখেছিলাম—রক্ত মাংসে গড়া এমিলিয়াকে? আমি কী দেখেছিলাম—এমিলিয়ার প্রেতাত্মা এসেছে আমার কাছে, না স্বপ্ন দেখছিলাম—স্বপ্ন-দেখার?

বার বার ভাবতে লাগলাম—আমি কী স্বপ্ন দেখেছি, না মায়ায় বিভ্রান্ত হয়েছি, না আলেয়া দেখেছি?····· না, এ রহস্য সমাধান করতে পারবো না কখনও।

স্নানের ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে তীরে উঠে জামা কাপড় পরলাম। তারপর রাস্তায় এসে বাস-এ উঠলাম আবার। অবিলম্বে বাড়ি ফিরবার ইচ্ছা হলো। কেন জানি না, মনে দৃঢ় ধারণা হলো—বাড়ি গেলেই এ রহস্যের সমাধান হবে। তাছাড়া, খাওয়া হয়নি এখনও, খেয়ে-দেয়ে মালপত্র গুটিয়ে নেবো, ছ'টার ষ্টীমার ধরবো। দেরী করে ফেলেছি অনেক! অল্পক্ষণের মধ্যেই বাগানবাড়িতে ফিরে এলাম।

······খাবার ঘরটি নির্জন, কিন্তু টেবিলটি বেশ সাজানো। টেবিলের উপর প্লেটের কাছে একখানি টেলিগ্রাম। বিনা দ্বিধায় বিরক্তিভরে হলদে খামটি খুললাম। নীচে বাক্তিসত্তার নামটি লেখা রয়েছে দেখে

অবাক হয়ে গেলাম। কেন জানি না, সুসংবাদের আশা জাগলো মনে। টেলিগ্রামটি পড়লাম: "দুর্ঘটনায় আহত এমিলিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক······বাত্তিসতা।"

শিরার রক্ত মাথায় উঠলো।

ক্যাপ্রি থেকে যাবার আয়োজন-পর্ব সম্বন্ধে কিছু বলা অবান্তর।···

···সেদিন বিকেলেই নেপলস্-এ গিয়ে জানলাম—মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে এমিলিয়া। বিচিত্র তার মৃত্যু। বুকের উপর চিবুক রেখে মাথা নিচু করে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। বাত্তিসতা যথারীতি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটি গোরুর গাড়ি সামনে পড়লো। বাত্তিসতা খুব জোরে ব্রেক চাপলেন, ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে একবার ঝুঁকে পড়লো এমিলিয়া। গাড়োয়ানের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর গাড়ি চালিয়ে দিলেন বাত্তিসতা। কিন্তু এমিলিয়া কোন কথা বলল না, বাত্তিসতার কথার কোন উত্তর দিল না।

গাড়িটি মোড় ঘুরতেই, এমিলিয়া বাত্তিসতার গায়ের উপর ঢলে পড়লো। গাড়ি থামিয়ে বাত্তিসতা দেখলেন—দেহ নিষ্প্রাণ। হঠাৎ ব্রেক-এর চাপে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লেগে এমিলিয়ার মেরুদণ্ডের শিরা ছিঁড়ে যায়। ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে এমিলিয়া।

···অসহ্য গরম—শোকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক; কেন না, শোক চায়—মনে একাধিপত্য করতে, অন্য কোন ভাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চায় না।

দিনটা ছিল গুমোট। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, স্যাঁৎসেতে থমথমে আবহাওয়ায় শেষ এলো এমিলিয়ার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া।

···সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ঘরের দরজাটি বন্ধ করলাম। আজ মনে হলো এ ঘরটি চিরকালের জন্য অপ্রয়োজনীয়।

সত্যই এমিলিয়া নেই, এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে গেছে সে, তাকে এ জীবনে আর খুঁজে পাবো না কোথাও! এতটুকুও হাওয়া নেই বাইরে। তবু জানালাগুলি খুলে দিয়ে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে লাগলাম। নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি। দম বন্ধ হ'য়ে যাবে যেন।

পাশের বাড়িগুলোর খোলা জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো চোখে পড়লো। ঘরে ঘরে লোকজন ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে, আনন্দে মেতে রয়েছে। চঞ্চল উন্মাদ হয়ে উঠলো আমার মন। কল্পনার চোখে ভেসে উঠলো একটি জগৎ—যেখানে লোকে ভুল না বুঝে শুধু ভালবাসে, বিনিময়ে পায় ভালবাসা, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সুখময় জীবন যাপন করে, আর—যে জগৎ থেকে আমি হয়েছি চির নির্বাসিত। আবার সে-জগতে প্রবেশ করতে হলে চাই—এমিলিয়ার জবাব, আমার নির্দোষিতা সম্বন্ধে অবিচল বিশ্বাস, আর চাই—অলৌকিক প্রেম। সে প্রেম শুধু আমাদের প্রাণে জাগিয়ে তুললে চলবে না, জাগাতে হবে অপরের প্রাণেও।…কিন্তু আর তো তা সম্ভব নয়।

ভাবলাম, এমিলিয়ার মৃত্যু আমার প্রতি তার চরম শত্রুতারই নিদর্শন।…আমি যেন উন্মাদ হয়ে যাবো—যেন আর বাঁচতে পারবো না।……

কিন্তু বেঁচে রইলাম।……

পরদিন আবার সুটকেশটি হাতে নিয়ে বাইরে এসে ঘরের দরজায় তালা লাগালাম। দারোয়ানের হাতে চাবিটি দিয়ে বললাম, ক'দিন পরে ঘুরে এসেই ঘরটি ছেড়ে দেবো।……

ক্যাপ্রিতে ফিরে এলাম আবার। যেখানে এমিলিয়া আমায় শেষ দেখা দিয়েছিল হয়তো সেখানে, কিংবা আর কোথাও, আবার সে

দেখা দেবে আমায়। তখন তাকে বলবো—কেন ঘটেছিল এত সব ঘটনা, আবার তাকে জানাবো আমার প্রেম, সে দেবে প্রেমের প্রতিশ্রুতি, ভালবাসবে আমায়।...

জানতাম, আমার এ আকাঙ্ক্ষাও একটা উন্মাদনা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, বাস্তব ও মায়ার প্রতি সমান আকর্ষণে এমন যুক্তিপূর্ণ উন্মাদনা আর জাগেনি কখনও।......

নিদ্রায় বা জাগরণে এমিলিয়া আমায় দেখা দেয়নি আর। কিন্তু সে যখন আমায় শেষবার দেখা দেয়—সেই সময়ের সঙ্গে তার মৃত্যু-সময়ের কোন মিল ছিল না। যখন এমিলিয়াকে নৌকার উপর দেখেছিলাম তখনও সে বেঁচেছিল, যখন আমি মূর্ছিত হয়ে সৈকতের উপর পড়ে গিয়েছিলাম তখনই হয়তো সে মারা যায়। সুতরাং তার মৃত্যু ও জীবনে সত্যিকারের কোন সঙ্গতি ছিল না।

কখনও জানতে পারবো না, কী হয়েছে এমিলিয়া—আলেয়া, মায়া, স্বপ্ন, না আর কিছু। যে অনিশ্চয়তা জীবনে আমাদের সম্পর্ক বিষময় করেছিল, এমিলিয়ার মৃত্যুর পরেও তা রয়ে গেছে।......

এমিলিয়াকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় ও যেখানে তাকে শেষ বার যেখানে দেখেছি সে-যায়গাগুলি দর্শনের আকুলতায় একদিন এলাম বাগান-বাড়ির নিচে সৈকতভূমিতে—যেখানে তাকে নগ্ন অবস্থায় শায়িত দেখেছিলাম, চুম্বনের স্বপ্ন দেখেছিলাম।......

নির্জন বেলাভূমি।

পাথরের স্তূপের ভিতর দিয়ে এসে চোখ তুলে চাইলাম—হাস্যময় অনন্ত বিস্তার নীল সিন্ধুর দিকে।

মনে পড়লো—'ওডিসি'র কথা, ইউলিসিস ও পেনিলোপের কথা। ইউলিসিস ও পেনিলোপের মতো আমার এমিলিয়াও হয়তো চির বিশ্রাম

সুখ উপভোগ করছে—বিশাল জলধির বুকে লীন হয়ে গেছে, মিশে গেছে অনন্তকালের সঙ্গে।

এমিলিয়াকে আবার খুঁজে নেওয়া ও নিশ্চিন্তে বসে তার সঙ্গে পার্থিব আলাপ-আলোচনা করা নির্ভর করছে আমারই ওপর—স্বপ্ন বা আলেয়ার উপর নয়। আবার তার দেখা পেলেই তো সে মুক্তি পাবে আমার কাছ থেকে, চলে যেতে পারবে আমার আবেগের গণ্ডী ছাড়িয়ে, সান্ত্বনা ও সৌন্দর্যের প্রতিমার মতো অপলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে চিরদিন!

সমাপ্ত